সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

সেপ্টেম্বর ২০২৩

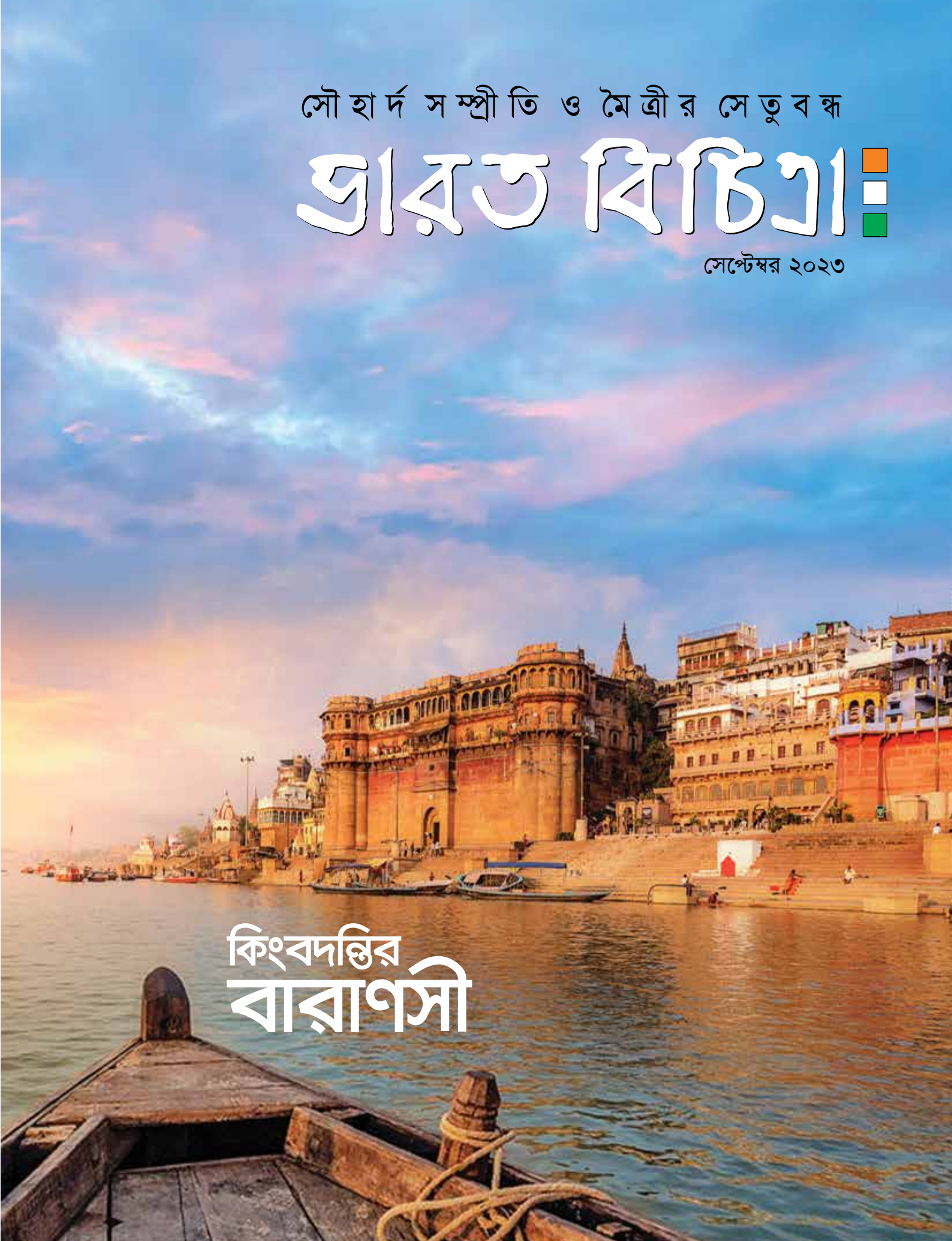

কিংবদন্তির বারাণসী

২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ ভারতীয় হাই কমিশন-ঢাকা বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ার রবীন্দ্র কুঠিবাড়িতে ডকুমেন্টারি ফিল্ম 'ছিন্নপত্র : পদ্মা পাড়ে রবীন্দ্রনাথ'-এর প্রিমিয়ার স্ক্রিনিংয়ের আয়োজন করে। ড. চঞ্চল খান পরিচালিত ডকুমেন্টারি ফিল্মটি ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত কুঠিবাড়িতে থাকাকালীন সময়ে গুরুদেব ঠাকুর তাঁর ভাইঝি ইন্দিরা দেবীকে যে চিঠিগুলো লিখেছিলেন, সেসবের সংকলনের একটি বর্ণনা।

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্যে চলচ্চিত্রটিকে গুরুদেবের অন্তর্জগৎকে গভীরভাবে জানতে একটি উৎকর্ষ কাজ হিসেবে বর্ণনা করেন। তিনি ভারত ও বাংলাদেশ উভয় দেশ থেকে এই চলচ্চিত্র নির্মাণে অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের অবদানের প্রশংসা করেন এবং গুরুদেব ঠাকুরের জীবন ও কর্মকে ভারত ও বাংলাদেশের একটি যৌথ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি এই ধরনের সহযোগিতামূলক কাজসমূহকে সাংস্কৃতিক বন্ধন ও মানুষে-মানুষে গভীর সংযোগের প্রতিফলন হিসেবেও বর্ণনা করেছেন, যা আমাদের সম্পর্কের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এই অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়ার মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব সেলিম আলতাফ জর্জ।

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ ৫১ | সংখ্যা ০৯ | ভাদ্র-আশ্বিন ১৪৩০ | সেপ্টেম্বর ২০২৩

High Commission of India, Dhaka
www.hcidhaka.gov.in; /IndiaInBangladesh
@ihcdhaka; /hcidhaka; /HCIDhaka

Bharat Bichitra
/BharatBichitra

অরবিন্দ চক্রবর্তী
সম্পাদক
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯ এক্স : ১১৪২
মোবাইল : +৮৮০১৮৫২০৪৬০২৮
e-mail : inf2.dhaka@mea.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর
ভারতীয় হাই কমিশন
প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিকস শ্রী বিবেকানন্দ মৃধা
মুদ্রণ ডট নেট লিমিটেড ৫১-৫১/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত
ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত
লেখকের নিজস্ব। এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোনো যোগ নেই।
এ পত্রিকার কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়।

কেন্দ্রবিন্দু
তেলেঙ্গানা

তেলেঙ্গানা ভারতের সর্বকনিষ্ঠ রাজ্য। ২ জুন ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক যাত্রা শুরু হয়। রাজ্যের সংখ্যায় কনিষ্ঠ হলেও এর রয়েছে আড়াই হাজার বছরেরও পুরোনো সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনীতির এক গৌরবময় ইতিহাস।

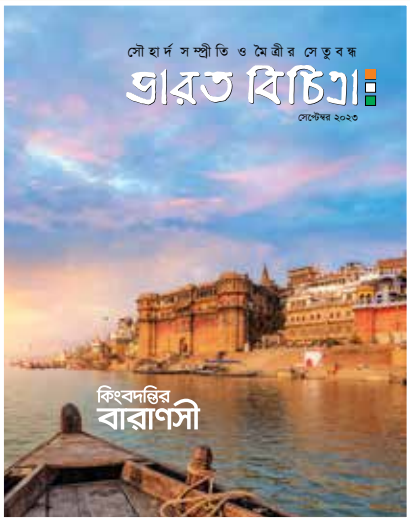

সূচিপত্র

প্রবন্ধ — জি-২০-র প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারত বৈশ্বিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ॥ অ্যাম্বাসেডর অশোক মুখার্জী ০৩
প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর *সবুজপত্র* ॥ বদিউর রহমান ১০
প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঢাকার স্মৃতি ॥ বিভূতিভূষণ মণ্ডল ১৪
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানের জগৎ ॥ সরকার আবদুল মান্নান ১৮
আধ্যাত্মবাদ ও বিভূতিভূষণ ॥ হামিম কামাল ২৬
বিনয়ের *ফিরে এসো, চাকা*
জীবনানন্দ পরবর্তী প্রাতিস্বিক সংযোজন ॥ পারভেজ আহসান ২৯
বিজ্ঞান — চন্দ্রযান-৩ অভিযান
মানবসমাজে একীভূত হওয়ার সম্ভাব্য প্রতীক প্রজ্ঞান ॥ আসিফ ০৬
ছোটগল্প — যুগলবন্দি ॥ পলাশ মজুমদার ২১
পঙ্‌ক্তিমালা — দেবদাস আচার্য ॥ মজিদ মাহমুদ ॥ জিললুর রহমান
আলফ্রেড খোকন ॥ স.ম. শামসুল আলম ॥ জয়শীলা গুহ বাগচী
পলাশ দে ॥ অরুণাভ রাহারায় ॥ সাফিনা আক্তার
সীমান্ত হেলাল ॥ শ্যাম পুলক ২৪-২৫
অনূদিত কবিতা — কমলা দাস সুরাইয়ার কবিতা
অনুবাদ : সন্তু জানা ৩২
ধারাবাহিক উপন্যাস — বহ্নিলতা ॥ অমর মিত্র ৩৪
কেন্দ্রবিন্দু — তেলেঙ্গানা ॥ শান্ত জাবালি ৩৮
ভ্রমণ — ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তির বারাণসী ॥ কবীর হোসেন ৪২
জন্মাষ্টমী — শ্রীকৃষ্ণ : বৈচিত্র্যপূর্ণ এক চরিত্রের আখ্যান ॥ সুদেব চক্রবর্তী ৪৪
শেষ পাতা — স্নেহময়ী মাদার তেরেসা ॥ সুরুয খান ৪৮

সম্পাদকীয়

বাংলা গদ্যের চলিত রীতিকে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনে প্রমথ চৌধুরী এবং তাঁর সম্পাদিত 'সবুজ পত্র' সাময়িকীর বিস্তর ভূমিকা। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা ভাষার অন্যতম সাময়িকী ছিল 'সবুজ পত্র'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ খ্রি., বাংলা ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসে। এটি গতানুগতিক সাময়িকপত্র ছিল না। তাই 'সবুজ পত্রে' কখনো কোনো বিজ্ঞাপন এবং ছবি প্রকাশিত হয়নি। পরিশীলিত, রুচিশীল বিদগ্ধ নাগরিক মন নিয়ে সম্পাদক চেয়েছিলেন স্বভাবে-চারিত্র্যে-আচরণে-ভাষায় এক যুক্তিঋদ্ধ ঋজুতা ও মেদহীন ব্যক্তিত্বের প্রজ্জ্বলন। পত্রিকাটির এই বোধই সাহিত্যক্ষেত্রে নতুন পথের সন্ধানী করেছিল। যুক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, মার্জিত রসিকতা এবং পরিশীলিত সংস্কৃতিরুচিবোধ হয়ে ওঠে 'সবুজ পত্র'-এর ভিত্তিভূমি।

প্রথম পর্যায়ে এটি ১৩২১-১৩২৯ বঙ্গাব্দ প্রতিমাসে অর্থাৎ নিয়মিত প্রকাশিত হয়। ১৩২৭-এর ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা একসঙ্গে প্রকাশিত। ১৩২৮-এর প্রথম 'সবুজ পত্র' প্রকাশ বন্ধ থাকে। শ্রাবণ সংখ্যা প্রকাশিত হয় 'সম্পাদকের কৈফিয়ত'সহ। এরপর ক্রমশ অনিয়মিত হতে থাকে। ১৩২৮-এর শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যার পর ছয় মাসে প্রকাশ হয় তিনটি সংখ্যা। প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩২৮ এবং বৈশাখ ১৩২৯ যৌথসংখ্যা। এরপর 'সবুজ পত্র' প্রকাশনা পুনরায় বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্যায় পর্যন্ত 'সবুজ পত্র' প্রকাশের সংখ্যা ৮২টি। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'সবুজ পত্রে'র প্রকাশনা শুরু হয় ১৩৩২ বঙ্গাব্দে। দ্বিতীয় পর্যায় 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হলে সে সংবাদ 'দৈনিক আনন্দবাজার' পত্রিকার 'ঘরে বাইরে' শিরোনামে ছাপা হয়। সাময়িকীটি শেষ পর্যন্ত ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে বন্ধ হয়ে যায়।

'সবুজ পত্রে'র সর্বশেষ ১৩৩৪-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা। 'সবুজ পত্রে'র মাধ্যমে শুধু নিজ সাহিত্যচর্চায় নয়, 'সবুজ পত্রে'র লেখকগোষ্ঠীর চর্চার মধ্যেই প্রমথ চৌধুরী মুক্তচিন্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, যুক্তিতর্ক, গণতন্ত্র চর্চা, তীর্যক অভিব্যক্তি প্রকাশ ও স্বাধীনচিন্তার প্রতিফলন সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। সর্বোপরি বাংলা চলতি গদ্যের শিষ্টরূপ প্রদানে 'সবুজ পত্রে'র অবদান অনস্বীকার্য।

'সবুজ পত্রে'র মাধ্যমে নবসাহিত্য আন্দোলন পরিচালনায় প্রমথ চৌধুরী মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সাহিত্যবোধ, প্রজ্ঞা ও ভাবনা বিদগ্ধজনের বোধে উপভোগের খোরাক। যার ফলে প্রমথর এ সৃষ্টির যথার্থতায় রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্বল্পায়ু সত্ত্বেও 'সবুজ পত্র' নবপ্রজন্মের বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যরীতি গঠনে একটি প্রধান সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। প্রমথ চৌধুরী নতুন সাহিত্যরীতি প্রবর্তনের চেষ্টা হিসেবে কথ্য বাংলাকে অগ্রাধিকার দেন, যা তাঁর ছদ্মনাম 'বীরবল' থেকে 'বীরবলী' ভাষা হিসেবে পরিচিত। এরপর থেকে বাংলা সাহিত্যে কথ্য বাংলা ভাষার বিশেষ মর্যাদা লাভ। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রনাথের লিখিত গদ্য এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্য 'সবুজ পত্রে'র সাফল্য যথেষ্টভাবে প্রমাণ করে। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রমথ চৌধুরীর এ অবদান বাংলাভাষীগণ চিরদিন মনে রাখবে।

এ সংখ্যার অন্যতম আলোকপাত ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তির বারণসী। বরুণা ও অসি নামের দুটি নদী থেকে 'বারাণসী'র নামায়ণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন শহরগুলোর মধ্যে বিশেষ অবস্থান করে নিয়েছে 'বারাণসী' বা 'বেনারস'। উত্তর ভারতের মধ্যগাঙ্গেয় অববাহিকায় বারাণসীর অবস্থান। এটি কাশী বিশ্বনাথ হিসেবেও সমান পরিচিত। পুরাণে বর্ণিত আছে শিব এই শহরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আরও কথিত, মহাদেবের ত্রিশুলের ডগায় এই বেনারসের অবস্থান। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র তীর্থস্থান বারাণসী। সারা বছর এখানে ভক্তসমাগম থাকে। ষোড়শ মহাজনপদের অন্যতম ছিল কাশী। প্রাচীনকাল থেকেই কাশী ধর্ম ও শিক্ষার পীঠস্থান। ভারতের শিল্প-সংগীত-সংস্কৃতির জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ এই শহর। জ্ঞানচর্চারও বিশিষ্ট কেন্দ্র। শুধু হিন্দু নয়, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মশিক্ষারও পীঠস্থান এটি। বারাণসীতে গঙ্গাতীরে অনেক ঘাট রয়েছে। এর মধ্যে দশাশ্বমেধ ও মণিকর্ণিকা ঘাট উল্লেখযোগ্য। জনশ্রুতি রয়েছে, মণিকর্ণিকা ঘাটে শেষকৃত্য হলে আত্মা মুক্তি লাভ করে, আর পুনর্জন্ম হয় না। ধর্ম হোক বা ইতিহাস-ঐতিহ্য হোক, কিংবদন্তিতে ঘেরা বারাণসী সব ধরনের পর্যটকের কাছেই আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। বিচিত্র এই বারাণসীর অংশত উঠে এলো 'ভারত বিচিত্রা'র প্রচ্ছদপটে।

এছাড়া প্রতিবারের মতো নিয়মিত বিভাগ থাকছে।

সকলের মঙ্গল হোক।

প্রবন্ধ

জি-২০-র প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারত

বৈশ্বিক সহযোগিতাকে অগ্রাধিকার প্রদান করে

অ্যাম্বাসেডর অশোক মুখার্জী

১ ডিসেম্বর ২০২২-এ, ভারত গ্রুপ অব ২০ (জি-২০)-এর প্রেসিডেন্সি গ্রহণ করে। জি-২০ ১৯টি প্রধান অর্থনীতি ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বিশ্বব্যাপী জিডিপির ৮৫%, বিশ্ববাণিজ্যের ৭৫%-এরও বেশি এবং বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে গঠিত। ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির মূল সুর হলো 'এক পৃথিবী, এক পরিবার, এক ভবিষ্যৎ', যা সংস্কৃতে বসুধৈব কুটুম্বকম বাক্যাংশ দিয়েও প্রকাশ করা হয়। বৈশ্বিক সমস্যাসমূহের প্রতি ভারতের সামগ্রিক পরস্পর নির্ভরশীল দৃষ্টিভঙ্গি ফলপ্রসূ ও ন্যায়সঙ্গত বৈশ্বিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে থাকে। ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ ভারতে জি-২০ শীর্ষ সম্মেলন চলাকালীন সময়ে, ভারতের ৫০টিরও বেশি শহরে ৩২টি পৃথক কর্মধারার মধ্য দিয়ে জি-২০ কর্মপরিকল্পনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জি-২০-এর প্রায় ২০০টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। এটি বৈশ্বিক সহযোগিতার জন্য একটি বিশাল সুযোগ প্রদান করে

২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এজেন্ডা ২০৩০ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার সময় বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ সশস্ত্র সংঘাতের শিকার হয়েছিল। ২০২২ সালের মধ্যে, এই সংখ্যাটি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৪ মিলিয়নে পৌঁছেছে। ২০১৫ সালে, বিশ্বব্যাংকের মতে, বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছিলেন

জি-২০ প্রেসিডেন্ট হিসেবে ভারত ঘোষিত ছয়টি অগ্রাধিকার হলো: জলবায়ু পরিবর্তনসহ জলবায়ুবিষয়ক কার্যাবলি; অন্তর্ভুক্তিমূলক ও স্থিতিস্থাপক বিকাশ; টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ; প্রযুক্তিগত রূপান্তর ও ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার; নারী নেতৃত্বাধীন উন্নয়ন; এবং সংশোধিত বহুপাক্ষিকতা।

এখন পর্যন্ত ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ বৈঠকসমূহে বিপুলসংখ্যক তরুণ-তরুণীসহ সকল সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের ওপর জোর দিয়ে ভারতের প্রচেষ্টা হলো জি-২০ কার্যকলাপসমূহকে 'মানবকেন্দ্রিক' করা। ২০২২ সালের নভেম্বরে অনুষ্ঠিত জি-২০ বালি শীর্ষ সম্মেলন পুনর্ব্যক্ত করে যে, জি-২০ 'বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য প্রধান ফোরাম' হিসেবেই রয়ে গেছে। জি-২০-তে ভারতের প্রেসিডেন্সি সচেতনভাবে এই অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে বৃহত্তর বৈশ্বিক সহযোগিতার ওপর দৃষ্টি দিয়েছে।

বিশ্বব্যাপী সহযোগিতার ক্ষেত্রে আজকের প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ সশস্ত্র সংঘাতের প্রভাব এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কোভিড-১৯ অতিমারির মতো নজিরবিহীন ব্যাঘাত থেকে উদ্ভূত। ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ (এসডিজি) নিয়ে টেকসই উন্নয়নের এজেন্ডা ২০৩০ বৈশ্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একমাত্র সর্বজনীন কাঠামোর প্রতিনিধিত্ব করে। দুটি পরিসংখ্যান এজেন্ডা ২০৩০ যে প্রতিবন্ধকতাসমূহের সম্মুখীন, সেগুলোর বর্তমান গুরুতর মানবকেন্দ্রিক মাত্রাকে চিত্রিত করে।

জাতিসংঘের মতে, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে এজেন্ডা ২০৩০ সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হওয়ার সময় বিশ্বব্যাপী প্রায় ৬০ মিলিয়ন মানুষ সশস্ত্র সংঘাতের শিকার হয়েছিল। ২০২২ সালের মধ্যে, এই সংখ্যাটি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৩২৪ মিলিয়নে পৌঁছেছে। ২০১৫ সালে, বিশ্বব্যাংকের মতে, বিশেষ করে সাব-সাহারান আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় প্রায় ৭০০ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছিলেন। ২০২২ সাল নাগাদ, সারা বিশ্বে প্রায় ৬৮৫ মিলিয়ন মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে ছিলেন, যার মধ্যে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন মূলত উন্নয়নশীল দেশগুলোতে কোভিড-১৯ অতিমারির কারণে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে যান। প্রতিবেদনে গুরুত্বসহ উল্লেখ করা হয়েছে যে, কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো বিশ্বব্যাপী বৈষম্য বেড়েছে, বিশ্বের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর আয় হ্রাস ছিল বিশ্বের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তিবর্গের আয় হ্রাসের চেয়ে দ্বিগুণ বেশি।

ফলস্বরূপ, ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির অগ্রাধিকার হলো ৩১ ডিসেম্বর ২০৩০-এর সময়সীমার মধ্যে এজেন্ডা ২০৩০ অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বৈশ্বিক সহযোগিতার গতিবেগকে পুনরুজ্জীবিত করা। চিহ্নিত এসডিজিসমূহ প্রেসিডেন্সি চলাকালে ভারত কর্তৃক নির্ধারিত ছয়টি অগ্রাধিকারকে অন্তর্ভুক্ত করে। ভারত যে ছয়টি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে, সেই ক্ষেত্রগুলোতে ভারতের গৃহীত জাতীয় উদ্যোগসমূহ অন্যান্য জি-২০ রাষ্ট্রসমূহকে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে জানানো হয়েছে। জি-২০-এর মধ্যে বৃহত্তর বৈশ্বিক সহযোগিতাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ভারতের সক্ষমতার শক্তিশালী ভিত্তি রয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন : জলবায়ুসংক্রান্ত কর্মকাণ্ড রক্ষায় ভারতের ভূমিকা জলবায়ুবিষয়ক কার্যকলাপকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করার ক্ষেত্রে ভারতের উদ্যোগের উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাব রয়েছে। দুটি যুগান্তকারী প্রস্তাব হলো পরিবেশের জন্য গ্লোবাল লাইফস্টাইল (LIFE) এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়া এবং উন্নয়নের জন্য নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার করা। ২০১৫ সালের প্যারিস কনফারেন্স অব পার্টিস অব দ্য ইউএন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেইঞ্জ চলাকালীন সময়ে প্রণীত সৌরশক্তির ব্যবহার সম্পর্কিত ভারত-ফ্রান্সের যৌথ প্রস্তাবের ফলে ভারতভিত্তিক একটি নতুন বহুপাক্ষিক আন্তঃসরকারি সংস্থা, ইন্টারন্যাশনাল সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ) সৃষ্টি হয়। আজ, প্রায় ১২০টি দেশ আইএসএ-এর সদস্য, যার লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে সোলার এনার্জি সলিউশনে ১,০০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করা, ১,০০০ মিলিয়ন মানুষের কাছে ক্লিন এনার্জি সলিউশন ব্যবহার করার মাধ্যমে এনার্জিতে অ্যাক্সেস সৃষ্টি করা এবং এর ফলে ১,০০০ গিগাওয়াট সোলার এনার্জি ক্যাপাসিটি স্থাপন করা। জি-২০ প্রেসিডেন্সি চলাকালীন সময়ে, ভারত জি-২০-এর উন্নত সদস্য দেশসমূহ কর্তৃক আর্থিকভাবে এবং পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির অবাধ স্থানান্তরের মাধ্যমে অবদান রাখার প্রয়োজনীয়তার ওপর দৃষ্টি দিয়েছে যাতে বিশ্বব্যাপী পরিবেশবিষয়ক লক্ষ্যসমূহ পূরণের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জাতীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা যায়।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি : ২০১৯ সালে ইউএন ক্লাইমেট অ্যাকশন সামিটে প্রণীত গ্লোবাল কোয়ালিশন ফর ডিজাস্টার রেসিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার (সিডিআরআই)-এর জন্য ভারতের ফ্ল্যাগশিপ উদ্যোগ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার এবং স্থিতিস্থাপক সাপ্লাই চেইন তৈরি করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জি-২০-এর মধ্যে ক্রমবর্ধমান গুরুত্বারোপের ওপর নির্ভর করে, বিশেষ করে কোভিড-১৯ অতিমারি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী প্রাকৃতিক দুর্যোগের একটি সিরিজের পরে। দুর্যোগ ও জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলা করার লক্ষ্যে অবকাঠামোসমূহকে স্থিতিস্থাপক করার জন্য মান ও প্রবিধানের উন্নয়নের দ্বারা, উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে দ্বিমুখী জ্ঞান স্থানান্তরের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি টেকসই করার উদ্দেশ্যে সিডিআরআই বহু-স্টেকহোল্ডার পদ্ধতির প্রসারণ ঘটাতে চায়। সিডিআরআই সচিবালয়ের আয়োজক ভারত বর্তমানে এই উদ্যোগের একক বৃহত্তম আর্থিক অবদানকারী।

টেকসই উন্নয়ন : উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এজেন্ডা ২০৩০ এবং এর এসডিজিসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে তাদের জাতীয় লক্ষ্য পূরণে সহায়তা করার জন্য, ভারত ও জাতিসংঘ ২০১৭ সালে ইন্ডিয়া-ইউএন ডেভেলপমেন্ট পার্টনারশিপ ফান্ড সৃষ্টি করেছে। ভারত থেকে ১৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আর্থিক সহায়তায়, এই তহবিল স্বল্পোন্নত দেশসমূহ, স্থলবেষ্টিত-উন্নয়নশীল দেশসমূহ এবং ছোটো উন্নয়নশীল দ্বীপরাষ্ট্রসমূহের উন্নয়ন প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকার প্রদান

করেছে। এ পর্যন্ত, ৩৭টি অংশীদার দেশে ৩৬টি প্রকল্প এই তহবিলের অধীনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

প্রযুক্তিগত রূপান্তর : একটি 'হোল অব সোসাইটি' পদ্ধতির মাধ্যমে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে শাসন ও ক্ষমতায়নের জন্য ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে ভারতের সফল অভিজ্ঞতা তাকে জি-২০ প্রেসিডেন্সি চলাকালীন বিশ্বাসযোগ্য থট-লিডার করে তুলেছে। ভারত ইউএনডিপির সঙ্গে অংশীদারত্বে, নিজেকে একটি গ্লোবাল হাব হিসেবে অবস্থান দেওয়ার লক্ষ্যে বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য নিম্ন বাস্তবায়ন খরচে মানবকেন্দ্রিক ডিজিটাল পাবলিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার তৈরি করার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত ও আন্তঃপরিচালনযোগ্য মান ব্যবহার করার অভিপ্রায়ে জি-২০ বৈঠকের একটি সিরিজ আয়োজন করেছে।

নারীর ক্ষমতায়ন : ভারত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে নারীদের ডিজিটাল ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ মিটিংগুলোর বর্তমান ফোকাসের মধ্যে রয়েছে নারীদের জন্য শিক্ষার ওপর কার্যকর প্রচারণা, কর্মক্ষেত্রে নারীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণ, নেতৃত্বের আসনে নারীদের বৃহত্তর প্রতিনিধিত্ব, এবং লিঙ্গ সমতার ক্ষেত্রে চিহ্নিত বৈষম্যসমূহ ক্রমাগত সংকুচিত করা।

বহুপাক্ষিক সংস্কার : এজেন্ডা ২০৩০-এর প্রস্তাবনা জোর দিয়ে উল্লেখ করে 'শান্তি ছাড়া টেকসই উন্নয়ন হতে পারে না এবং টেকসই উন্নয়ন ছাড়া কোনো শান্তি হতে পারে না।' 'এটি যুদ্ধের যুগ নয়' উল্লেখ করে ভারত এই প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছে। যাই হোক, শান্তি, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে বিদ্যমান বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানের অকার্যকরতা 'সংস্কার বহুপাক্ষিকতাবাদ'-এর আহ্বানকে তুলে ধরেছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্য জাতিসংঘ সনদের অধীনে দায়বদ্ধ জাতিসংঘ ও এর নিরাপত্তা পরিষদের মতো বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংস্কারের জন্য জি-২০-কে গুরুতর চেষ্টা চালাতে হবে (যেখানে ২০০৫ সালে বিশ্বনেতৃত্ব কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে গৃহীত বাধ্যতামূলক সংস্কারগুলোকে নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্য অবরুদ্ধ করে রেখেছে); ইন্টারন্যাশনাল মনিটারি ফান্ড/ওয়ার্ল্ড ব্যাংক, আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক আর্থিক সমন্বয় নিশ্চিত করতে তাদের আর্টিকেল অব এগ্রিমেন্ট দিয়ে বাধ্যতামূলক করেছে (যেখানে ২০১০ সালে আইএমএফ কোটা ও শাসনকার্যের সংস্কারে সম্মত হয়েছিল, যা উন্নত দেশগুলোর বিলম্বিত কৌশলের কারণে এখন পর্যন্ত অবাস্তবায়িত রয়ে গেছে); এবং ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন, বৈষম্যহীনতার ওপর ভিত্তি করে বহুপাক্ষিকভাবে সম্মত বাণিজ্যবিধিসমূহের প্রাধান্য নিশ্চিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছে (যেখানে সংস্থার অখণ্ডতা ও কার্যকারিতা বাড়ানোর জন্য সংস্কারসমূহ ২০১৬ সাল থেকে উন্নত দেশগুলো একপক্ষবাদ ও সুরক্ষাবাদের ক্রমবর্ধমান প্রশ্রয়ের কারণে শোষিত হচ্ছে)।

২০২২ সালের নভেম্বরে বালি সম্মেলনে ভারত যখন জি-২০-এর সভাপতিত্ব গ্রহণ করে, তখন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ঘোষণা করেছিলেন যে, ভারতের 'জি-২০ অগ্রাধিকারসমূহ কেবল আমাদের জি-২০ অংশীদারদের সাথেই নয়, গ্লোবাল সাউথে আমাদের সহযাত্রীদের সঙ্গেও আলোচনার মাধ্যমে আকার পাবে, যাদের কণ্ঠ প্রায়ই অশ্রুত রয়ে যায়।' ১২-১৩ জানুয়ারি ২০২৩-এ, ভারত একটি ভার্চুয়াল 'ভয়েস অব দ্য গ্লোবাল সাউথ ফর হিউম্যান-সেন্ট্রিক ডেভেলপমেন্ট' শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করে। ভারতের এই উদ্যোগের গুরুত্বের একটি পরিমাপ এই সত্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ১২৫টি দেশ এই উদ্যোগে সাড়া দিয়েছে, যাদের মধ্যে আফ্রিকা থেকে ৪৭টি, এশিয়া থেকে ৩১টি, ল্যাটিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে ২৯টি, ওশেনিয়া থেকে ১১টি এবং ইউরোপ থেকে ৭টি দেশ রয়েছে। ২৭ মার্চ ২০২৩-এ, জাতিসংঘে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের 'বহিঃর্দেশীয়' প্রকৃতি এবং 'উন্নয়নের অধিকার'-এর ওপর বিরূপ প্রভাবের কারণে একতরফা নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করে সমাধান গ্রহণের পক্ষে অপ্রতিরোধ্যভাবে ভোট প্রদান করে।

ভারতের প্রেসিডেন্সির অধীনে জি-২০-এর আলোচনাসমূহ দুটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে নেওয়া হবে। জি-২০-এর মধ্যে, তিনটি প্রধান উন্নয়নশীল দেশ (ভারত, ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকা) গ্লোবাল সাউথের অগ্রাধিকারসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ২০২৩-২০২৫ এর মধ্যে একটি তিন বছরের সময়সীমায় জি-২০-এর নেতৃত্ব প্রদান করবে। জি-২০ ছাড়াও, আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বাড়ানোর চলমান প্রক্রিয়াসমূহ ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের এসডিজি শীর্ষ সম্মেলনের সঙ্গে সম্মুখে আসবে, এর পরে ২০২৪ সালে জাতিসংঘের সামিট অব দ্য ফিউচার অনুষ্ঠিত হবে। এই শীর্ষ সম্মেলনসমূহের ফলাফলস্বরূপ, জাতিসংঘের সনদ পর্যালোচনা করার উদ্দেশে একটি সাধারণ সম্মেলনের আহ্বান জানানো হবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা এপ্রিল ২০২৩-এ কার্যকরী বহুপাক্ষিকতা বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিবের শীর্ষস্থানীয় উপদেষ্টা বোর্ডের সুপারিশ অনুযায়ী ২০২৫ সালে জাতিসংঘের ৮০তম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনের অনুরূপ হবে।

এটি একটি 'মানবকেন্দ্রিক' টেকসই উন্নয়নবিষয়ক দৃষ্টান্তকে একীভূত করার ক্ষেত্রে ভারতের জি-২০ প্রেসিডেন্সির জন্য একটি সুবর্ণ সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে, যা 'এক পরিবার হিসেবে বিশ্বের' কার্যকারিতা বজায় রাখার আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতির জন্য জনপ্রিয় সমর্থনকে পুনরুদ্ধার করবে। •

রাষ্ট্রদূত (অব.) অশোক মুখার্জী
বিশিষ্ট ফেলো, বিবেকানন্দ ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশন, নিউ দিল্লি

চন্দ্রযান-৩ অভিযান

মানবসমাজে একীভূত হওয়ার সম্ভাব্য প্রতীক প্রজ্ঞান

আসিফ

বিজ্ঞান

সম্প্রতি চাঁদে ভারত মহাকাশযানের সফল অবতরণ ঘটেছে। শুধু এই উপমহাদেশই নয় এ ঘটনা পুরো মানবপ্রজাতিকে আলোড়িত করেছে। সমগ্র বিশ্বে যে অস্থিতিশীল অবস্থা চলছে তার মধ্যে এটি নিঃসন্দেহে একটা আনন্দের এবং শান্তির সংবাদ বৈকি; প্রতিবেশী দেশ হিসেবে আমরাও খুব আপ্লুত। ৪০ দিনের অভিযান শেষে চাঁদে মহাকাশযানটি অবতরণ করেছে ২৩ আগস্ট ২০২৩; বাংলাদেশ সময় ৬টা ৩৪ মিনিটে। এর আগে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (বর্তমানে রাশিয়া), যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মহাকাশযান চাঁদে অবতরণ করেছে। তবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের অবতরণের দিক থেকে ভারতই প্রথম দেশ। ভারতের সাম্প্রতিকতম উৎকর্ষের নজির এই চন্দ্রযান-৩। ১৪ জুলাই অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে চন্দ্রযান-৩ যাত্রা শুরু করে। এভাবে চতুর্থ দেশ হিসেবে ভারত অভিজাত 'স্পেস ক্লাব' এ যুক্ত হলো। শুধু সফল অবতরণই নয়, ইতোমধ্যে পৃথিবীর ১৪ দিনের সমান দীর্ঘদিন কাটিয়ে চন্দ্রযান-৩ পৃথিবী থেকে দেওয়া সকল কার্যসম্পাদন করেছে; ১৪ রাতের সমান দীর্ঘরজনি কাটিয়ে ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার লেপমুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার চাঁদের কক্ষপথে পাঠানো দানুরি কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে শিবশক্তি নামের অবতরণ স্থলের বিস্তারিত ছবি তুলে পাঠিয়েছে

ভারতের বিজ্ঞানীরা, আগত নতুনদিনে বিক্রম ও প্রজ্ঞানের জেগে ওঠার এক প্রবল আশা ছিল। তবে ব্যাপারটি ঘটেনি, ঘটলে দারুণ উত্তেজনাকর হতো পৃথিবীর মানুষের কাছে। ল্যান্ডার ও রোভারের ভিতরে থার্মাল কন্ট্রোল ছাড়া মাইনাস দুশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে এ ধরনের যন্ত্রযানের টিকে থাকা বাস্তবিকই কঠিন তাই প্রমাণ হলো।

পটভূমি

২০১৯ সালে ২২ জুলাই চাঁদের দক্ষিণ মেরুর উদ্দেশে রওনা হয়েছিল চন্দ্রযান-২। ওই বছরের ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে নামার কথা থাকলেও শেষমুহূর্তে পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদে টাচডাউনের চেষ্টা করলে ব্রেকিং সিস্টেমে কিছু অসংগতি ধরা পড়ে এবং চাঁদের বুকে ভেঙে পড়ে। এরই ধারাবাহিকতায় চন্দ্রযান-৩ এর পরিকল্পনা নেওয়া হয়। মূলত ২০০৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো ভারতের লুনার এক্সপ্লোরেশন বা চন্দ্র অভিযানের কথা ঘোষণা করেন। ফলে ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর উৎক্ষেপন করা হয় চন্দ্রযান-১। চাঁদে নামার উদ্দেশ্য এর ছিল না, শুধু কক্ষপথে ঘোরার কথা ছিল। তবে ১০ মাস যোগাযোগের পর ২০১৯ সালের ২৮ আগস্ট এটির সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। তবে অভিযানের মূল উদ্দেশের ৯৫ শতাংশ সম্পাদিত হওয়ায় একে সফল অভিযান হিসেবে দেখা হয়। চাঁদে পানির উপস্থিতির প্রমাণ পায় চন্দ্রযান-১। তারই সাপেক্ষে দক্ষিণ মেরুতে চন্দ্রযান-৩ এর এই অভিযাত্রা।

দুটো কারণে এই অভিযান গুরুত্বপূর্ণ হয়েছে: একটা হলো দক্ষিণ মেরুতে এটা প্রথম সফল ল্যান্ডিং বা অবতরণ। দ্বিতীয়ত, এটা বাস্তবায়নে অনেক কম খরচ হয়েছে। ইসরোর তথ্য অনুসারে, চন্দ্রযান-৩ অভিযানে মোট ৬১৫ কোটি ভারতীয় রুপি বা ৭৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো খরচ হয়েছে। এমনকি চার বছর আগের চন্দ্রযান-২ এর চেয়েও এটা কম। সংবাদমাধ্যমে তথ্যানুযায়ী চন্দ্রযান-৩ এর খরচ হলিউডের অনেক বিগ বাজেট ছবি নির্মাণ খরচের চেয়েও কম। এত কম খরচে পৃথিবীতে কোনো সফল মহাকাশযান অভিযান চালানোর নজির কম আছে।

এদিকে ২০ আগস্ট চাঁদের শেষ কক্ষপথে পৌঁছার জন্য মাত্র একটা ধাপ বাকি ছিল রুশ মহাকাশসংস্থা রসকসমসের পাঠানো লুনা-২৫ এর; তখনই নিজের কক্ষপথ ছেড়ে কিছুটা এগিয়ে যাওয়ায় পৃথিবী থেকে মহাকাশযানটির সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়; মহাকাশ সংস্থাটি জানায় চাঁদের মাটিতে এটি ভেঙে পড়েছে। রুশ লুনা শেষবার চাঁদে যায় ১৯৭৬ সালে। রুশ মহাকাশযান লুনা-২৫ চাঁদের বুকে নামতে গিয়ে ভেঙে পড়ায় ভারতের এই অভিযান আরও গুরুত্ববহ হয়ে উঠেছে।

স্যাটেলাইট পাঠানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশ স্পেস এক্সের মতো বাণিজ্যিক কোম্পানির রকেটের ওপর নির্ভরশীল। তবে ভারতের রয়েছে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা বা নিজস্ব রকেট, নাম জিওসিনকোনাস স্যাটেলাইট লঞ্চ ভেহিকল মার্ক থ্রি। সংক্ষেপে বলা হয় জিএসএলভি এমকে-থ্রি। এতে করেই চন্দ্রযান-৩ পাঠানো হয়েছে। গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম বা জিপিএস ছাড়া জীবনযাপন আজকাল কঠিন। অন্য দেশের ওপর নির্ভরতায় না গিয়ে ভারত এই ধরনের ব্যবস্থাপনা নিজেই গড়ে তুলেছে যার নাম ন্যাভিগেশন উইথ ইন্ডিয়ান কন্সটেলেশন; সংক্ষেপে নাভিক। এই ব্যবস্থা ভারতে পর্যাপ্ত কাজ করতে পারে বলে দাবি করা হয়। চন্দ্রযান-৩ অভিযানে এই ন্যাভিগেশন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়েছে।

চাঁদের পথে যাত্রা শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় গতি অর্জনের জন্য মহাকাশযানটি পৃথিবীকে পাঁচটি ভিন্নভিন্ন পরিমাপের কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করেছিল। কক্ষপথে স্থাপন কৌশলের (পৃথিবী-বাউন্ড পেরিজি ফায়ারিং) মাধ্যমে মহাকাশযানকে একটি কক্ষপথ থেকে পরবর্তী কক্ষপথে স্থানান্তর করা হয়েছিল, এই প্রক্রিয়া মোট ৪ বার প্রয়োগ করা হয়। আরও একটি কক্ষপথ স্থানান্তরের কৌশল ২৫ জুলাই চালু করা হয়েছিল।

প্রপালশান মডিউল দ্বারা ট্রান্স-লুনার ইনজেকশন বার্নটি ২০২৩ সালের ৩১ জুলাই শুরু হয়, এবং মহাকাশযানকে ১ আগস্ট ট্রান্সলুনার ইনজেকশন দিয়ে ২৮৮ কিমি X ৩,৬৯,৩২৮ কিমি পরিমাপের ট্রান্সলুনার কক্ষপথ স্থাপন করা হয়েছিল, যা মহাকাশযানটিকে চাঁদের দিকে নিয়ে যায়।

মহাকাশ অভিযানের সংক্ষেপ

এই ঘটনাটি আমাকে শত বছরের ক্রমাগ্রগতির ইতিহাসের দিকে নিয়ে যায়। মানুষের মহাকাশ অভিযানের ধারাবাহিকতায় প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক, কুকুর লাইকা, ইউরি গ্যাগারিন, ভ্যালেন্তনা তেরেস্কোভা হয়ে মাইকেল কলিন্সের সহায়তায় নিল আমস্ট্রং, অ্যাডইউন বাজ অলড্রিন, চাঁদে পৌঁছে যান। চাঁদে শুধু ওই দুজনই যাননি। গেছেন একে একে ১২ জন। '৬৯ থেকে '৭২ সালের মধ্যে ঘটনাগুলো ঘটেছে। এদের মধ্যে ছয়জন এখনো বেঁচে আছেন। সর্বমোট ছয়টি চন্দ্রাভিযানে ১২ নভোচারীর আটজনই চন্দ্রপৃষ্ঠে হাঁটাহাঁটি করেছেন, বাকি চারজন লুনার রোভারে চড়ে চাঁদের বিস্তীর্ণ এলাকা সরেজমিন প্রত্যক্ষ করেছেন। তবে এই অভিযানের ধারাবাহিকতা থাকেনি।

তারা যে চাঁদে গিয়েছিলেন সেই চাঁদ সম্পর্কে গ্যালিলিও গ্যালিলি চারশত বছর আগে অনেক কিছু বলেছিলেন, চাঁদ সম্পর্কে গ্রহ গতিবিদ্যার জনক জোহানস কেপলার দ্য ড্রিম নামে একটি সায়েন্স ফিকশন লিখে ফেলেছিলেন। কেপলার নিজেকে নায়কের ভূমিকায় রেখে চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখেছিলেন। চাঁদের সত্যিকার অভিযাত্রীরা এই বিজ্ঞানীর পর্যবেক্ষণের সত্যতার প্রমাণ পেয়েছিলেন। হয়তো কেপলারের মতো স্বপ্ন আর যুক্তি দিয়ে এবড়োখেবড়ো চাঁদ থেকে পৃথিবীকে দেখেছিলেন। আর বলেছিলেন ওই হলো পৃথিবী, নীলাভ সাদা!

সম্প্রতি পানি বা জলের প্রমাণ হওয়ায় দক্ষিণ মেরুই অভিযানের লক্ষ্য ছিল। চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটা একবারে অন্যরকম। ৩ কোটি ৮০ লাখ বর্গ কিলোমিটার অনউন্মোচিত পৃষ্ঠ। এই পৃষ্ঠ উন্মোচনের পথে চন্দ্রযান-৩ পথিকৃতের ভূমিকা নিল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। এটা সৌরশক্তির ওপর নির্ভরশীল হওয়ায় দুই সপ্তাহ পর্যায়ক্রমিকভাবে একের পর এক পর্যবেক্ষণ চালিয়েছে, চন্দ্রপৃষ্ঠে কী ধরনের খনিজ পদার্থ রয়েছে তার একটি স্পেকট্রোমিটার অ্যানালাইসিসও রয়েছে। যেহেতু চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে ১৪ দিন পরপর দিনরাত হয়। ফলে পরিকল্পনা ছিল এমনভাবে, যাতে ভোর হতে না হতে ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে। দরজা খুলে বিক্রমের পেটের ভিতর থেকে রোভার প্রজ্ঞান বেরিয়ে আসবে। বাস্তবিকই তাই হয়েছে। জানা গেছে সৌরশক্তি দ্বারা চালিত হওয়ায় সূর্যের আলো থাকা পর্যন্ত প্রায় ১৪ দিন পর্যন্ত সে কাজ চালিয়ে গেছে। বহু তথ্য উপাত্ত পাঠিয়েছে, অনেক সম্ভাবনা আরোপ করেছে। ভারত গবেষকদের নিরলস প্রচেষ্টায় পৃথিবীর মানুষ চাঁদের দক্ষিণ মেরু সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবে সামনের দিনগুলোতে। দিল্লির শিব নাদার বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবটিক্সের শিক্ষক ড. আকাশ সিনহা বিবিসিকে বলছিলেন, চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে অবতরণের ঝুঁকি যেমন আছে, তেমনই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সম্ভাবনাও এই অঞ্চলেই বেশি। তাই হয়েছেও।

চারকোনো বাক্সের আকৃতির ল্যান্ডারে চারটি ল্যান্ডিং পা এবং চারটি ল্যান্ডিং থ্রাস্টার রয়েছে। রয়েছে চারটি পেলোড রম্ভা, চ্যাস্টে, ইলসা এবং অ্যারে। চাঁদে অবতরণের পরপরই কাজ শুরু করে ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকা এই চারটি পেলোড। চারটি পেলোডের মধ্যে চাঁদের বুকে সূর্য থেকে আসা প্লাজমা কণার ঘনত্ব, পরিমাণ এবং পরিবর্তনগুলো নিরীক্ষণ করে রম্ভা (রেডিয়ো অ্যানাটমি অব মুন বাউন্ড হাইপারসেন্সিটিভ আয়নোস্ফিয়ার অ্যান্ড অ্যাটমোস্ফিয়ার)। চ্যাস্টে (চন্দ্র'স সারফেস থার্মোফিজিক্যাল এক্সপেরিমেন্ট) মেপে দেখেছে চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা। আশপাশের মাটির কম্পনসংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করছে ইলসা (ইনস্ট্রুমেন্ট ফর লুনার সিসমিক অ্যাক্টিভিটি)। পাশাপাশি 'লেজার রেট্রোরিফ্লেক্টর' অ্যারে চাঁদের গতিশীলতা বোঝার চেষ্টা করেছে।

অন্যদিকে একাধিক যন্ত্রপাতি নিয়ে চাঁদে নেমেছে রোভার। রোভারে রয়েছে ছয়টি চাকা। এটি এক সেকেন্ডে এক সেন্টিমিটার দূরত্ব অতিক্রমে সক্ষম। ইসরো জানিয়েছে এটি ১০০ মিটারের দূরত্ব অতিক্রম করেছে।

প্রজ্ঞান ছবি তুলে বিক্রমে পাঠায়; সেখান থেকে এগুলো কক্ষপথ হয়ে পৃথিবীতে আসে। প্রজ্ঞানে রয়েছে লেজার-ইনডিউসড ব্রেকডাউন স্পেকট্রোস্কোপ (এলআইবিএস)। নমুনা সংগ্রহ করে তা লেজার প্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষা করেছে। বেঙ্গালুর ইসরোতে ইলেক্ট্রো-অপটিকস সিস্টেমের গবেষণাগারে এই প্রযুক্তি তৈরি হয়েছে। এখনো পর্যন্ত চাঁদের মাটিতে যা যা মিলেছে তাতে বেঁচে থাকার অন্যতম কিছু রসদ আছে। আর অবতরণের পর থেকে দুই সপ্তাহ ধরে স্পেকট্রোমিটার বিশ্লেষণে চাঁদের ভূমির গঠনের প্রকৃতি, কোন ধরনের খনিজ বস্তু রয়েছে, তা খতিয়ে দেখেছে প্রজ্ঞান। এসব পরীক্ষা করার জন্য ল্যান্ডার এবং রোভারের সঙ্গে রয়েছে পাঁচটি বিশেষ যন্ত্র। ইতোমধ্যে প্রজ্ঞানের পেলোডগুলো চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সালফার বা গন্ধক, এবং আয়রন ও উপস্থিতি নিশ্চিত করেছে; বিক্রমের যন্ত্রগুলো দক্ষিণ মেরুতে দিনের শুরু রাতের আরম্ভের তাপমাত্রার ফারাকও মেপেছে। নির্ধারিত সময়ের আগে (৭ বা ৮ সেপ্টেম্বর এর মধ্যে) চাঁদের মাটিতে তাদের সকল অ্যাসাইনমেন্ট সম্পূর্ণ করে ফেলে। পর্যাপ্ত চার্জ থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত সময়ের আগে প্রজ্ঞানকে চার্জমুক্ত করে স্লিপমুডে নিয়ে যাওয়া হয়। এর পিছনে কারণ হলো ১৪ দিন পরে জেগে ওঠার একটা আশা।

খুঁজে পাওয়া উপাদান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য

সালফার : সালফারের এই সম্ভাবনা পৃথিবীর বাইরে জীবনের অস্তিত্বের সম্ভাবনা আরও প্রবল করে তুলেছে। ভিনগ্রহের আবহমণ্ডল সম্পর্কে ধারণা পেতে যা জরুরি। পৃথিবীতে প্রাণ সৃষ্টির পিছনে একটা বড়ো ভূমিকা রয়েছে সালফারের। বেশ কিছু গাছ এবং ব্যাকটেরিয়া উৎপন্ন করে সালফার। অ্যামিনো অ্যাসিডসহ বেশ কিছু উৎসেচকও পাওয়া যায়।

তাপমাত্রার পার্থক্য : ল্যান্ডার বিক্রম চন্দ্রপৃষ্ঠের এবং চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০ সেন্টিমিটার নিচের তথ্য সংগ্রহ করেছে। দেখা গেছে, ওপর ও নিচের তাপমাত্রায় চরম পার্থক্য রয়েছে। চন্দ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায় ৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস হলেও এর পৃষ্ঠের প্রায় ৩ ইঞ্চি নিচে তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস দেখা গেছে। দিনের বেলায় ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠতে পারে। আবার রাতে তা মাইনাস ১৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। এমনকি মাইনাস ২৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রাও রেকর্ড করা হয়েছে। ইসরোর সঙ্গে যুক্ত মিলা মিত্রের মতে, চাঁদের পৃষ্ঠ তাপমাত্রা অপরিবাহী। এর ফলে চাঁদে বসতি স্থাপনের ক্ষেত্রে তাপ, শীত ও বিকিরণকে দূরে রাখতে এই জ্ঞান কাজে লাগানো যাবে। এটি চন্দ্রপৃষ্ঠের নিচে বরফের উপস্থিতির একটি ইঙ্গিত হতে পারে।

পানি

চন্দ্রযান-৩ থেকে আমরা জানি, অক্সিজেন যেহেতু পাওয়া গেছে তাতে হাইড্রোজেনের সন্ধান মিললে সেখানে জলের অস্তিত্ব সুনিশ্চিত হবে। আর জল থাকলে জীবনের অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব। বসতি গড়াও সম্ভব। ২০০৮ সালে চাঁদের কক্ষপথ থেকে ইসরোর পাঠানো চন্দ্রযান-১ থেকে জলের সন্ধান পায়। তার আনা তথ্যউপাত্তের ভিত্তিতে নেচার অ্যাস্ট্রোনমি জার্নালে এক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। এখান থেকে চাঁদে জলের উদ্ভবের একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে পৃথিবীর ইলেক্ট্রন থেকেই চাঁদে জলের অস্তিত্বের সন্ধান মিলেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মানোয়ার হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক চন্দ্রযান ১-এর পাঠানো রিমোট সেন্সিং ডেটা বিশ্লেষণ করেই এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়েছেন। তাঁদের মতে, পৃথিবীর প্লাজমা স্তরের প্রভাবে চাঁদের পাথর ও খনিজের উপাদান ভেঙে যায়। এগুলো দ্রবীভূত করতে পৃথিবীর ইলেক্ট্রনগুলো বিশেষ সাহায্য করছে। পৃথিবীর প্লাজমা স্তরে যে উচ্চশক্তির ইলেক্ট্রন থাকে, সেগুলোই চাঁদে জল তৈরিতে সাহায্য করেছে।

হিলিয়াম-৩

চাঁদে যাবার জন্য সবদেশ মরিয়া হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এর একটা কারণ হচ্ছে হিলিয়াম-৩। জীবাশ্ম জ্বালানি একদম ফুরিয়ে আসছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা হিলিয়ামের এই রূপ অফুরান শক্তির উৎস। হিলিয়ামের একটা হালকা আইসোটোপ হলো হিলিয়াম-৩ যার মধ্যে দুটো প্রোটন রয়েছে

কিন্তু নিউট্রন মাত্র একটি। এর কথা প্রথম বলে অস্ট্রেলিয়ার পদার্থবিদ মার্ক অলিফারেজ ও রবার্ট করনোঙ। পৃথিবীর বুকে হিলিয়াম-৩ এর খোঁজ না পাওয়া পর্যন্ত এটিকে একটি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ হিসেবে মনে করা হচ্ছিল। এর বায়ুমণ্ডল বা প্রাকৃতিক গ্যাসের কূপ থেকে খুব অল্প পরিমাণ হিলিয়াম-৩ এর খোঁজ পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা পৃথিবীতে বিরল হলেও চাঁদের মাটিতে হিলিয়াম-৩ এর পরিমাণ প্রচুর। এই আইসোটপটি ফিউসন চুল্লিতে পরমাণু শক্তি সরবরাহ করতে পারে। হিসেবে বলছে ৫ হাজার কিলোগ্রাম কয়লা পোড়ালে যে শক্তি উৎপাদন হয়, মাত্র চল্লিশ গ্রাম হিলিয়াম-৩ থেকে তৈরি হয় ততটাই শক্তি। এই হিলিয়াম-৩ মৌল থেকে অপ্রচলিত উপায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করলে তেজস্ক্রিয়তার বিপদও এড়ানো যাবে পুরোপুরি। বিজ্ঞানীদের ধারণা চাঁদে ১১ লাখ মেট্রিক টন হিলিয়াম-৩ রয়েছে যা ১০ হাজার বছর ধরে চলতে পারে।

এছাড়াও চাঁদে রয়েছে ল্যান্থানাইড, স্কান্ডানিয়াম, ইট্রিয়ামের মতো বিরল ধাতু। স্মার্টফোন বা উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এই ধাতুগুলোর ব্যবহার অপরিসীম। কিন্তু এসব খনিজ পদার্থ সংগ্রহ করা মোটেই সহজ নয়। এর জন্য প্রয়োজন হবে উন্নত প্রযুক্তির রোবট। তা ছাড়া খনিজ পদার্থগুলোকে পৃথিবীতে নিয়ে আসা বেশ খরচসাপেক্ষ। তবুও এই খনিজগুলো অধিকার পেতে কোমর বেঁধে নেমেছে বিশ্বের ছোটবড় সব দেশ। এছাড়াও অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, লোহা, ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, সিলিকনের খোঁজ মিলেছে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

বর্তমানে ইউরোপ ও রুশ মহাকাশ সংস্থার তত্ত্বাবধানে চাঁদে স্থায়ী বসবাসের ঠিকানা গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোও এই ধরনের প্রকল্প নিয়ে পরিকল্পনা শুরু করেছে। বেসরকারিভাবে চাঁদ ও মহাকাশে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করছে অনেক কোম্পানি। মানববসতি স্থাপনের আশাবাদে 'মুন ভিলেজ তৈরির পরিকল্পনা করছেনও তারা এবং সেটা থ্রিডি প্রিন্টারে। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, চাঁদে মানুষের জীবনধারণের উপযোগী বাসস্থানের অবকাঠামো তৈরি করার কাজে রোবট ব্যবহার করা হবে। আমরা সাধারণেরা ভালোভাবেই বুঝতে পারছি, এক সময় 'চাঁদের শহর' বা ব্যাস ক্যাম্প থেকেই শুধু মঙ্গল নয় মহাকাশের বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করা হবে।

তবে সমস্যা হচ্ছে চাঁদ অভিযানে পুরো মানবজাতিকে একীভূত দেখতে পাচ্ছি না বরং বিভাজন বাড়ছে। কেউ কারও গবেষণা তথ্যউপাত্তকে নিয়ে বিনিময়ে যেতে চাইছে না; এই প্রবণতা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির পথে অন্তরায়। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নিজস্ব পতাকা উড়ানো হচ্ছে, সাথে অন্তত জাতিসংঘের একটা পতাকাও তো দরকার, নইলে পৃথিবীর প্রতিনিধিত্ব কেমন করে হবে? এর সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ, চাঁদের প্রথম মানব পদার্পনের ঘটনা। রাষ্ট্রসংঘের পরিবর্তে শুধু মার্কিন পতাকা লাগানোতে বিষয়টা কিছুটা সংকীর্ণ হয়েতো পড়ে। তবুও আর্মস্ট্রংয়ের কণ্ঠ থেকে কথা বেরিয়ে এসেছিল মানবজাতির প্রতিনিধিত্বশীল বক্তব্য, এটি একজন মানুষের জন্য ক্ষুদ্র একটি পদক্ষেপ, কিন্তু মানবজাতির জন্য বিশাল অগ্রযাত্রা। মূলত ১৯৬৯ সালের ২০ জুলাই অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযানে মোট তিনজন চাঁদের কক্ষপথে পৌঁছান। মাইকেল কলিন্সকে কক্ষপথে মূল নভোযানে রেখে ঈগল চন্দ্রযানে আর্মস্ট্রং ও অ্যাডউইন বাজ অলড্রিন অবতরণ করেন। আর মাইকেল কলিন্স কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। যথাসময়ে তাদের আবার তুলে নেবার জন্য। ঈগল থেকে বেরিয়ে চাঁদে দ্বিতীয় পা রেখেছিলেন এডউইন অলড্রিন। অলড্রিন চাঁদের বিস্তীর্ণ সৌন্দর্য দেখে মন্তব্য করেছিলেন, 'অভাবনীয় নির্জনতা।'

চাঁদে একটি প্রতিফলক রেখে এসেছিলেন নভোচারীরা, যা দিয়ে পৃথিবী থেকে লেজার লাইটের মাধ্যমে চাঁদের দূর পরিমাপ করা যায়। পায়ের ছাপ রয়েছে, তাদের ফ্লাগের প্রমাণও রয়ে গেছে। আরও অনেক ধরনের সন্দেহের অবসান ঘটানোর পরও অনেকে বৈজ্ঞানিক উপলব্ধির দুর্বলতায় অনেকেই একই প্রশ্ন তোলেন : 'চাঁদে মানুষ রাখেনি পা' বলে। বিশ্বাসও করেন অনেকে। বাণিজ্যের কারণে অনিয়ন্ত্রিত প্রাযুক্তিক বিকাশ মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে; বিজ্ঞানকে দেখেছে প্রযুক্তির মোড়কে জাদুর যন্ত্র হিসেবে। ফলে বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া বা যৌক্তিকতা সমাজ নিতে পারেনি। আস্থাও গড়ে ওঠেনি।

অথচ চাঁদে মনুষ্যনির্মিত যন্ত্র পদার্পনের পর ৬০ বছরের পথ আমরা অতিক্রম করেছি। বিজ্ঞানের অভাবিত অগ্রগতি ঘটেছে। দেশের ঊর্ধ্বে উঠে পৃথিবীবাসী বা আর্দিয়ান হতে কি পেরেছি? লাখ মানুষ শরণার্থী হয়ে জলে স্থলে মরুভূমিতে ঘুরে ফিরছে, কোনো দেশ বলে তাদের নেই, অথচ তারা তো পৃথিবীরই অধিবাসী। এদিকে চাঁদে যা পাওয়া যেতে পারে : পানি, সোনা, হিলিয়াম-৩, প্লাটিনাম ও দুর্লভ ধাতু। যে সম্ভাবনা চন্দ্রযান-৩ আরও ভালোভাবে ইঙ্গিত দিয়েছে, তাই বর্তমান প্রাযুক্তিক উন্নয়নে অনেক দেশ অভিযান চালানোর পরিকল্পনা করছে। জাপানের কোম্পানি আইস্পেস 'চাঁদ-পৃথিবী পরিবহন প্লাটফর্ম' নামের একটি পরিকল্পনা নিয়েছে, যার মাধ্যমে তারা চাঁদের মেরুতে অভিযান চালাতে চায়। তাহলে অলড্রিনের চাঁদের সেই 'অভাবনীয় নির্জনতা' কি টিকে থাকবে নাকি পৃথিবীর এই একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহটি বাণিজ্যিক আর রাজনৈতিক জমি ও সম্পদ দখলের লড়াইয়ে পরিণত হবে?

স্নায়ুযুদ্ধের সময় মহাকাশ অভিযান শুরুর পরপরই মহাকাশের নানা বস্তুর মালিকানার বিষয়টি একটি ইস্যু হয়ে ওঠে। যখন নাসা তাদের প্রথম মনুষ্যবাহী মহাকাশযান চাঁদে পাঠানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তখন জাতিসংঘে বহির্জগতের মহাকাশ চুক্তি নামের একটি চুক্তিপত্র গ্রহণ করে। ১৯৬৭ সালের ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্র, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাজ্য। সেখানে বলা হয়, পৃথিবীর বাইরের মহাশূন্যে, চাঁদ এবং অন্যান্য যেসব বস্তু রয়েছে, সেখানে কোনো দেশ দখল বা অন্য কোনোভাবে নিজেদের সম্পত্তি বলে দাবি করতে পারবে না। ১৯৭৯ সালে চাঁদ ও মহাশূন্যের অন্যান্য বস্তুতে বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলোর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার ক্ষেত্রে সমঝোতা প্রস্তাব আনে জাতিসংঘ, যেটি 'মুন এগ্রিমেন্ট' নামে বেশি পরিচিত। সেখানে মূল বিষয়গুলো ছিল, এসব কর্মকাণ্ড হতে হবে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশে এবং কোনো মহাকাশ স্টেশন বানাতে হলে আগে জাতিসংঘকে অবশ্যই জানাতে হবে কেন এবং কোথায় তারা সেটি বানাতে চায়; এই চুক্তি অনুযায়ী চাঁদের মাটিতে সার্বভৌমত্বের দাবি করা যায় না। মহাকাশযাত্রায় এগিয়ে থাকা কোনোদেশই এই চুক্তিতে সই করেনি। তবে আশার কথা হচ্ছে ভারত ১৮ জানুয়ারি ১৯৮২ সালে চন্দ্রচুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু এই চুক্তি স্বাক্ষর করেনি আমেরিকা, রাশিয়া বা চিন; ভারতের এই সফল অভিযানের পর অন্য সফল দেশও এই চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যাপারে এগিয়ে আসবে বলে আমরা আশা করতে পারি। তা না হলে পরিস্থিতি সংঘর্ষের দিকে যাবার আশংকা রয়েছে।

উল্লেখ্য চন্দ্রযান ল্যান্ডারের নাম বিক্রম হওয়ার পেছনে ভারতের মহাকাশ সাফল্যের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। বিক্রম সারাভাই ১৯৪৭ সালে মহাকাশ বিজ্ঞানের আঁতুড়ঘর বলে পরিচিত 'ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ সংস্থাই ইসরোর পূর্বসূরি। ১৯৭৫ সালে রুশ কসমোড্রাম থেকে ভারতে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' কে সফল উৎক্ষেপন করা হয় (আর্যভট্ট নামটি শূন্য আবিষ্কার ও গণিতের স্বর্ণোজ্জ্বল সময়ে কথা মনে করিয়ে দেয়)। এই সাফল্যের পিছনেও বিক্রম সারাভাই। আরও বহু সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে তিনি জড়িয়ে রয়েছেন। দুর্ভাগ্য তিনি এই অগ্রযাত্রা দেখে যেতে পারেননি। মাত্র ৫২ বছরে মারা গিয়েছিলেন।

ল্যান্ডারের পেটের ভিতর ছিল রোভার প্রজ্ঞান। নানারকম বৈজ্ঞানিক সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে প্রথমবার বেড়িয়ে এসেছিল চাঁদকে পর্যবেক্ষণ করার প্রত্যয় নিয়ে। ২২ সেপ্টেম্বর নবাগত সূর্যের আলোয় জেগে ওঠে তাহলে আবার বেরিয়ে আসার আশাও তৈরি করেছিল। না হলেও ক্ষতি নেই, আমাদের এ অঞ্চলের মানুষদের মনে মহাকাশ নিয়ে আগ্রহ তৈরি করেছে। সে আগ্রহ হয়তো চাঁদে পরিভ্রমণের কেপলার, নিউটন থেকে আরম্ভ করে কত মানুষের স্বপ্নের ইতিহাসের কথা মনে করিয়ে দেবে : কত কষ্টকর সংগ্রামের সর্পিল পথ; সত্যিই মানুষ ছড়িয়ে পড়ছে মহাজাগতিক পরিসরে। রোভারটির নামকরণ হয়েছে 'সংস্কৃত' শব্দ 'প্রজ্ঞান' থেকে, যার অর্থ প্রজ্ঞান বা জ্ঞান। এই জ্ঞান যেন বৃহত্তর মানবসমাজের একীভূত হওয়ার প্রতীক হয়ে উঠুক। •

আসিফ
বিজ্ঞান বক্তা; সম্পাদক, মহাবৃত্ত

প্রমথ চৌধুরী (৭ আগস্ট ১৮৬৮ – ২ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬)

প্রবন্ধ

প্রমথ চৌধুরী ও তাঁর সবুজপত্র

বদিউর রহমান

প্রমথ চৌধুরী (১৮৬৮-১৯৪৬) বেশ কয়েকটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন। এর মধ্যে 'সবুজপত্র' প্রথম পর্বে বৈশাখ ১৩২১ থেকে থেকে বৈশাখ ১৩২৯ এবং দ্বিতীয় পর্বে আশ্বিন ১৩৩২ থেকে ভাদ্র ১৩৩৪; 'রূপ ও রীতি' কার্তিক ১৩৪৭ থেকে শ্রাবণ ১৩৩৯; 'বিশ্বভারতী পত্রিকা' শ্রাবণ ১৩৪৯ থেকে আষাঢ় ১৩৫০। প্রমথ চৌধুরী আরো একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায় প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুইটি চিঠিতে। সে পত্রিকার নাম 'অলকা'। ১০ জানুয়ারি ১৯৪০ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা চিঠির একেবারে শেষের দিকে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

> 'ফিনল্যাণ্ডের একটা বিবরণ সংগ্রহ করে লিখেছি যদি মর্জি হয় অলকায় দিতে পার'। *(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড; পত্র সংখ্যা ১৩২, পৃষ্ঠা ৩১১-৩১২)*

এর ঠিক তিনদিন পরে, ১৩ জানুয়ারি ১৯৪০ শান্তিনিকেতন থেকেই আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন :

কল্যাণীয়েষু প্রমথ, ফিনল্যাণ্ড তুমি পরিচয়েই পাঠিয়ে দিয়ো। জিনিষটা সাময়িক কিন্তু অলকা পত্রটি অসাময়িক হয়ে পড়েছে, পঞ্জিকার বিধান মানে না। তোমাকে খুশি করবার জন্যই ওটা পাঠিয়েছিলুম। পরিচয়ে প্রাচীন হিন্দুস্থানের সমালোচনার জন্যে হাবলকে তুমি অনুরোধ কোরো। *(প্রাগুক্ত, পত্র নম্বর, ১৩৩, পৃষ্ঠা ৩১৩)*

রবীন্দ্রনাথের ওই লেখা প্রসঙ্গে নেপাল মজুমদার (১৯২৬-২০০১) তাঁর 'ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে লিখেছেন :

ফিনল্যাণ্ড সম্পর্কে কবি হাতের কাছে যে সব তথ্যাদি পাইলেন তাহারই ভিত্তিতে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়া তিনি 'অলকা'য় প্রকাশের জন্য প্রমথ চৌধুরীর নিকট উহা পাঠাইয়া দিলেন (১০ জানুয়ারী ১৮৪০)। উহা মাঘ সংখ্যা অলকায় (১৩৪৬) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি নানা দিক দিয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং উহা কোথাও সংকলিত হয় নাই। *(নেপাল মজুমদার, ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ষষ্ঠ খণ্ড (১৯৯৬), পৃষ্ঠা, ৮১)*

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি অন্য কোথাও সংকলিত হয়নি উল্লেখ করে নেপাল মজুমদার তাঁর ওই গ্রন্থে পুরো প্রবন্ধটি ছেপে দিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি চিঠি এবং এই সূত্র নিশ্চিত করে যে, প্রমথ চৌধুরী 'অলকা' নামে কোনো পত্রিকার সম্পাদক-কর্ণধার ছিলেন। এবং সে সময়টা ১৯৪০-এর দশক অর্থাৎ ১৯৪৬-১৯৪৭ হবে। প্রমথ চৌধুরী ও 'অলকা' প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ আছে নেপাল মজুমদারের আরও রচনায়। তিনি লিখেছেন:

প্রমথ চৌধুরী কিছুকাল থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিরূপ সমালোচনা করিয়া আসিতেছিলেন, 'অলকা', সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিতে। 'রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি' এবং রাশিয়ার পোল্যাণ্ড আক্রমণ ইত্যাদি ঘটনার সমালোচনা করিয়া তিনি আশ্বিন সংখ্যা 'অলকা'র সম্পাদকীয়তে লিখিলেন:

'একটিমাত্র অপ্রত্যাশিত খবর পাওয়া গিয়াছে। রাশিয়া পোল্যাণ্ডে– অর্থাৎ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে এবং অর্ধেক পোল্যাণ্ড– বেওয়ারিশ মাল বলে আত্মসাৎ করেছে। এ খবর শুনেও আমি চমকে উঠিনি। কারণ Bolshevism রাশিয়ার স্বদেশের শৃঙ্খলার নব পদ্ধতি। কিন্তু ইউরোপের রাজ্যমাত্রেই পরস্পরের শত্রু।...

জার্মানী ও রাশিয়ার মিলনেতে আমি বিস্মিত হয়েছি; কিন্তু এ মোতা বিবাহ যে অসম্ভব তা কখনই মনে ভাবিনি। রাশিয়াও Totalitarian State. জার্মানীও তাই; এ উভয়ের ভেতরের নাড়ীর যোগ। সুতরাং এ উভয়ের মিলন হচ্ছে সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। ['অলকা', আশ্বিন, ১৩৪৬; পৃষ্ঠা: ১০৪]

পৌষ সংখ্যার 'অলকা'য় সম্পাদকীয় মন্তব্যে তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন,

... বিলেতে এ-জাতীয় অনেকে রাশিয়া জার্মানীর পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় বিস্মিত হয়েছেন। এদেশেও দু'চারজন তাঁদের অনুরূপ প্রফেসার আছেন; তাঁদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, Franci-Prussian যুদ্ধের প্রাক্কালে Marx ও Engel যে manifesto বার করেন, তাতে জার্মানদের ফ্রান্স ধ্বংস করার পরামর্শ দেন। কেননা ফ্রান্স ধ্বংস না হলে জার্মান জাতি মনে এক হবে না। আর তারা মনে এক না হলে স্বদেশে Conmunism প্রতিষ্ঠা করতে পারবে না। অতএব পররাষ্ট্রের ও পর সম্প্রদায়ের বিনাশ সাধন Conmunism এর চিরকেলে মত। রুশিয়া আর যাই হোক, pacifist নয়। এ তন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্ছে Class war। তবে বিলেতে নাকি এমন লোক আছেন যারা মনে করেন যে– If Stalin wants a league against Fascism he is right. If he wants a league with Fascism he is right (New Restament)। এদেশেও হয়ত এমন দু'চারজন এই জাতীয় রুশভক্ত থাকিতে পারেন, যাঁদের মন ঐ একই ছাঁচে ঢালা। ভক্তি মানেই অহৈতুক প্রীতি। ['অলকা', পৌষ, ১৩৪৬; পৃ: ৩৮৫] (প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা, ৮২ ও ৮৩)] ।

প্রমথ চৌধুরীর 'রূপ ও রীতি' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করেছেন বলে জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর 'প্রমথ চৌধুরী' গ্রন্থের পরিশিষ্ট ২ এর খ-এ উল্লেখ করেছেন। তার উল্লেখ মতে প্রমথ চৌধুরীর সম্পাদনায় 'রূপ ও রীতি' প্রকাশিত হয় কার্তিক ১৩৪৭ থেকে শ্রাবণ ১৩৪৯ পর্যন্ত। এর বাইরে 'রূপ ও রীতি' সম্বন্ধে আর কোনো তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

সবুজপত্র প্রকাশের প্রায় ৭০ বছর আগে এমনি একটি 'উদ্দেশ্যঘোষক' পত্রিকা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা। পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিলো 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র নীতি-আদর্শ ব্যাখ্যা ও প্রচার।

এর ১১ বছর পর 'মাসিক পত্রিকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ঘোষিত হয় 'নারীশিক্ষা' ও 'মনোরঞ্জন'। এর আর এক ঘোষণা ছিলো কথ্যরীতিতে সাহিত্য রচনা। প্যারিচাদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদার সম্পাদিত এই 'মাসিক পত্রিকা'য় প্রকাশিত হয় 'টেকচাঁদ ঠাকুর' ছদ্মনামে প্যারিচাঁদ মিত্রের নকশাধর্মী উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল'।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রথম সংখ্যায় (বৈশাখ ১২৭৯, এপ্রিল ১৮৭২) একটি পত্রসূচনা লিখেছিলেন। তাঁর ইচ্ছা ছিলো 'বঙ্গদর্শন' হবে বাঙালি শিক্ষিত সমাজের 'উক্তি-পত্র'; তাঁদের অর্জিত বিদ্যা, কল্পনাশক্তি, লেখনচাতুর্য এবং চিত্তোৎকর্ষ প্রকাশের ক্ষেত্র। 'বঙ্গদর্শন'-এর দৃষ্টিভঙ্গী হবে অপক্ষপাত–ঐতিহ্য আশ্রয়ী ও প্রাগ্রসর ভাবনার প্রকাশক। বলা যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যমান এবং নিয়ন্ত্রণ ছিলো 'বঙ্গদর্শন'কেন্দ্রীক। 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করে শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী গড়ে ওঠে। চার বছর প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দিলে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৮৭৮-এ 'বঙ্গদর্শন' আবার প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। এই পর্যায়ের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন :

বঙ্গদর্শনের সম্পাদকীয় কার্য ছাড়িলাম বটে, কিন্তু ইহার সহিত আমার সম্পর্ক বিচ্ছেদ হইল না।

সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রায় সাত বছর প্রকাশিত হয় 'বঙ্গদর্শন'। কিন্তু এর মান নিয়ে সন্তুষ্ট না হওয়ায় ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্দেশে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এর প্রায় আঠারো বছর পরে প্রকাশিত হয় নবপর্যায় 'বঙ্গদর্শন'। এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩০৮ থেকে চৈত্র ১৩১২ (১৯০১-১৯০৫) এই পাঁচ বছর। 'বঙ্গদর্শন' সকল পর্যায়ে বাঙালি মন, মনন আর মানস বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সমসাময়িক সময়ের আরো কয়েকটি পত্রিকা : 'যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর, সাহিত্যে আমরা তাহারই আলোচনা করিব' উদ্দেশ্য নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতির সম্পাদনায় 'সাহিত্য' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১২৯৭ (১৮৯০) থেকে। 'সাধনা' প্রকাশিত হয় ১২৯৮ (১৯০১) সনে। 'সাধনা'র সম্পাদক-প্রকাশক ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিন বছর পর চতুর্থ বৎসরে 'সাধনা'র দায়িত্ব নেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৯০১ খিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসী'। 'প্রবাসী' সম্পাদনা করেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৩)। বিশ শতকের গোড়ার দিকে 'প্রবাসী' ছিলো উল্লেখযোগ্য সাহিত্যপত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত মাসিকপত্র 'ভারতবর্ষ' প্রকাশিত হয় ১৩২০ (১৯১৩) সনে। বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অনুরূপা দেবী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ছিলেন 'ভারতবর্ষ'-র লেখক।

১৩২১/১৯১৪-তে প্রকাশিত হয় (দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫) সম্পাদিত মাসিকপত্র 'নারায়ণ'। 'নারায়ণ' প্রকাশিত হয় নয় বছর অর্থাৎ ১৩২৯ পর্যন্ত। 'সবুজ পত্র' এবং রাবীন্দ্রিক চিন্তাধারার সঙ্গে 'নারায়ণ'-এর মতবিরোধিতা ছিল সর্বজনবিদিত। 'নারায়ণ' গোষ্ঠীভুক্ত লেখকদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ।

এই একই বছর ঘটে 'সবুজপত্র'র আবির্ভাব (১৯১৪)। 'সবুজ পত্র'র

ভরা যৌবনকালে গল্প-মাসিক হিসেবে প্রকাশিত হয় 'কল্লোল'। 'কল্লোল' প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩৩০ [১৯২৩] থেকে। পরে অবশ্য 'কল্লোল' আর কেবল গল্পের সীমায় সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর সম্পাদক ছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ (১৮৯৪-১৯২৫) ও দীনেশচন্দ্র দাশ (১৮৮৮-১৯৪১)। 'কল্লোল'-এর ঘোষণা ছিলো :

> 'উদ্ধত যৌবনের ফেনিল উচ্ছলতা সমস্ত বাধাবন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ'।

এই পত্রিকার দিশারী ছিলো 'ফোর আর্টস ক্লাব'। বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' লেখকগোষ্ঠীর প্রভাব ছিলো ব্যাপক ও বিস্তৃত; যা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসধারায় 'কল্লোলের কাল' বলে চিহ্নিত হয়ে আছে।

প্রায় সমসাময়িক সময়ে সজনীকান্ত দাসের (১৯০০-১৯৬২) সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'শনিবারের চিঠি' (শ্রাবণ ১৩৩১/১৯২৪)। তিন বছর পর শনিবারের চিঠি মাসিক পত্রিকায় রূপান্তরিত হয়। সমসাময়িক সময়ের প্রখ্যাত কবি-লেখকদের বিদ্রুপবাণে জর্জরিত করাই ছিলো শনিবারের চিঠির উদ্দেশ্য ও আদর্শ। ব্যঙ্গাত্মক কুরুচিপূর্ণ ভাষা প্রয়োগ ছিলো এঁদের ভাষারীতি। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সবাই ছিলেন শনিবারের চিঠির আক্রমনের লক্ষ্য। এঁদের ব্যঙ্গবিদ্রুপের প্রতিক্রিয়া জানাতে কাজী নজরুল ইসলামের উচ্চারণ :

> প্রতি শনিবারী চিঠিতে প্রেয়সী গালি দেন, 'তুমি হাড়িচাঁচা'!

সমসাময়িক সময় স্বতন্ত্রভাবধারা ঘোষণা নিয়ে প্রকাশিত আর একটি মাসিক পত্রিকা 'কালিকলম'। 'কালিকলম' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৪-১৯৮৮)। 'কল্লোল'-এর সঙ্গে 'কালিকলম'-এর আদর্শিক ঐক্য ছিলো ঘনিষ্ঠ।

'কল্লোল' প্রকাশের সাত বছর পর ১৯৩১-এ প্রকাশিত হয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)-র সম্পাদনায় মাসিক 'পরিচয়'। 'পরিচয়'-এর ঘোষিত নীতি ছিলো সাহিত্য হবে সমাজ প্রগতির হাতিয়ার। এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অঙ্গীকারাবদ্ধ বিশিষ্ট কবি-সাহিত্যিক-মনীষীরাই 'পরিচয়'-এর সঙ্গে যুক্ত হন এবং এক বিশাল পরিধি গড়ে তোলেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-র পর এর সম্পাদনার দায়িত্ব নেন গোপাল হালদার। 'পরিচয়'-এর প্রকাশনা এখনো বহমান।

'পরিচয়' প্রকাশের ১৭ বছর আগে ১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়ে প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র'। প্রকৃতপক্ষে বাঙালি পাঠক-মনন উজ্জীবিত করার চাবুকের ভূমিকা পালন করার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। যুক্তি বিচারের প্রতি শ্রদ্ধা, উন্নত প্রসাদগুণ, সুদৃঢ় প্রকৃস্থতা, মার্জিত রসিকতা, সূক্ষ্ম রুচিশীলতা এবং পরিশীলিত সংস্কৃতিবোধ ছিলো 'সবুজপত্র'-র সাহিত্যচর্চার ভিত্তিভূমি। প্রমথ চৌধুরী বহু পঠনশীল লেখক-সাহিত্যিক। তাঁর জীবনের অনন্যসাধারণ কীর্তি 'সবুজপত্র'। 'সবুজপত্র' কেবল একটি মাসিক সাহিত্য পত্রিকা নয়, আরো কিছু, অন্য কিছু। প্রমথ চৌধুরী ছিলেন 'সবুজপত্র'র সম্পাদক ও কর্ণধার।

তারিখ ও লেখার স্থান উল্লেখহীন প্রমথ চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা সম্বন্ধে লিখেছেন :

> সেই কাজটার কথা চিন্তা কোরো। যদি সেটা বের করাই স্থির হয় তাহলে শুধু চিন্তা করলে হবেনা– কিছু লিখতে শুরু কোরো। কাগজটার নাম যদি 'কনিষ্ঠ' হয় ত কি রকম হয়। আকারে ছোট– বয়সেও। শুধু কালের হিসাবে ছোট বয়স নয়, ভাবের হিসাবে। *(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিঠিপত্র পঞ্চম খণ্ড, পত্র সংখ্যা ১৮, পৃষ্ঠা ১৭১)*

রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাবিত পত্রিকার 'কনিষ্ঠ' নাম টেকেনি। পাবনায় অনুষ্ঠিত (২২-২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯১৪) উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রমথ চৌধুরী ও মণিলাল শিলাইদহ গেলে সম্ভবত তখনই আলোচনার মাধ্যমে পত্রিকার নাম 'সবুজপত্র' ঠিক হয়। ৫ মার্চ (১৯১৪) রবীন্দ্রনাথ শান্তি নিকেতন থেকে প্রমথ চৌধুরীকে এক চিঠিতে লিখেছেন :

> সবুজপত্র উদ্গমের সময় হয়েছে– বসন্তের হাওয়ায় সেকথা চাপা রইল না– অতএব সংবাদটা ছাপিয়ে দিতে দোষ নেই। আমি একটু ফাঁক পেলেই কিছু লেখার চেষ্টা করব। *(প্রাগুক্ত, পত্র নম্বর ১৯, পৃ, ১৭০)*

এর পর প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রতিটি চিঠিতে সবুজপত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ২৩ মার্চ ১৯১৪ শান্তিনিকেতন থেকে এক চিঠিতে লিখেছেন :

> আচ্ছা, রাজি আছি। ১৫ই বৈশাখেই বের কর। ইতিমধ্যে দুই একটা লেখা দিতে পারব। *(প্রাগুক্ত, পত্র, ২১, পৃ. ১৭৩)*

রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রের জন্য কবিতা লিখলেন 'সবুজের অভিযান'। এপ্রসঙ্গে রবিজীবনীকার প্রশান্ত পাল জানান :

> ১৫ বৈশাখ [মঙ্গল 28 Apr] বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশ শুরু হয়। এইদিনই রবীন্দ্রনাথ 'সবুজ পত্র' পত্রিকার জন্য 'ওরে নবীর ওরে আমার কাঁচা [দ্র, সবুজ পত্র, বৈশাখ। ১৭-১৯, 'সবুজের অভিযান'; বলাকা ১২। ১-৩(১)] কবিতাটি লিখে দেন। *(রবিজীবনী, সপ্তম খণ্ড [১৯৯৭], পৃষ্ঠা ৫)*

প্রতিটি আট ছত্রের মোট সাত স্তবকের 'সবুজের অভিযান'-এর প্রথম স্তবকটি যেন সবুজ পত্রের 'আশীর্বাণী' :

ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা,
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ,
আধমরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা
রক্ত আলোর মদে মাতাল ভোরে
আজকে যে যা বলুক বলুক তোরে,
সকল হেলায় তুচ্ছ ক'রে
পুচ্ছটি তোর উচ্চে তুলে নাচা।
আয় দুরন্ত, আয় রে আমার কাঁচা

লক্ষণীয় 'সবুজের অভিযান' তথা 'বলাকা' কাব্য থেকে রবীন্দ্রকাব্যধারার নবপর্যায়ের যাত্রা শুরু।

'সবুজপত্র' প্রথম প্রকাশিত হয় বৈশাখ ১৩২১-এ (১৯১৪)। 'সবুজ পত্র' প্রথম সংখ্যায় কোনো বিজ্ঞাপন ছিলো না। এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিলো ৬৮। প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন নন্দলাল বসু। তিনজন লেখকের মোট ছয়টি লেখা নিয়ে প্রকাশিত হয় এই সংখ্যাটি। এর মধ্যে দুটি প্রমথ চৌধুরীর, তিনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এবং একটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র। লেখক ও লেখার পৃষ্ঠা বিন্যাস ছিলো এরকম : প্রথম দুটি রচনা প্রমথ চৌধুরীর–'মুখপত্র' ও 'সবুজপত্র'; পৃষ্ঠাবিন্যাস যথাক্রমে ১-১১ ও ১১-১৬; পরের তিনটি লেখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের–'সবুজের অভিযান' 'বিবেচনা ও অবিবেচনা' ও 'হালদার-গোষ্ঠী'; পৃষ্ঠাবিন্যাস যথাক্রমে ১৭-১৯, ২০-৩২, ৩৩-৬৬। এর প্রথমটি কবিতা, পরেরটি প্রবন্ধ এবং শেষেরটি ছোটোগল্প। সবশেষে লেখাটি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-র কবিতা 'সবুজ পাতার গান'। 'সবুজ পাতার গান' মুদ্রিত হয় ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠায়।

পত্রিকার লক্ষ্য নির্দেশ করে সম্পাদক 'মুখপত্র' শিরোনামে লিখেছেন :

> সাহিত্য মানবজীবনের প্রধান সহায়, কারণ তার কাজ হচ্ছে মানুষের মনকে ক্রমান্বয় নিদ্রার আধার হতে ছিনিয়ে নিয়ে জাগরূক করে তোলা।.. আমরা যে দেশের মনকে ঈষৎ জাগিয়ে তুলতে পারি, এত বড় স্পর্ধার কথা আমি বলতে পারিনে,... তবে বাংলার মন যাতে আর বেশি ঘুমায়ে না পড়ে, তার চেষ্টা আমাদের আয়ত্মাধীন।... ইউরোপ আমাদের মনকে নিত্য ঝাঁকুনি দিচ্ছে, তাতে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। ইউরোপের দর্শন মনের গায়ে হাত বুলোয় না, কিন্তু ধাক্কা মারে। ইউরোপের সভ্যতা অমৃতই হোক মদিরাই হোক আর হলাহলই হোক, তার ধর্মই হচ্ছে মনকে উত্তেজিত করা, স্থির দেওয়া নয়।... ইউরোপের স্পর্শে আমরা, আর-কিছু না হোক, গতি লাভ করেছি, অর্থাৎ মানসিক ও ব্যবহারিক সকল প্রকার জড়তার হাত থেকে কিঞ্চিৎ মুক্তি লাভ করেছি। এই মুক্তির ভিতর যে আনন্দ আছে সেই আনন্দ হতেই আমাদের নবসাহিত্যের সৃষ্টি।

'সবুজপত্র'র প্রথম অর্থাৎ বৈশাখ সংখ্যার অখ্যানপত্র ছিলো এরকম :

> প্রথম সংখ্যা> ২৫ বৈশাখ> প্রথম বর্ষ/সবুজ পত্র/শ্রী প্রমথনাথ চৌধুরী সম্পাদিত/প্রকাশক–/কান্তিক প্রেস/২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা/ বার্ষিক মূল্য ছয় টাকা> এই সংখ্যার মূল্য/চারি আনা মাত্র/২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা কান্তিক প্রেস হইতে শ্রী হরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও/২০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা কান্তিক প্রেস হইতে শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ দালাল কর্তৃক প্রকাশিত।

রবীন্দ্রনাথ 'সবুজপত্র' সম্বন্ধে ছিলেন সদা সচেতন। প্রমথ চৌধুরীকে লেখা

তাঁর চিঠি পর্যালোচনা করলেই এর সত্যতা পাওয়া যায়। পত্রিকার দ্বিতীয় (জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যা হাতে পেয়ে ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩২১ রামগড় থেকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> 'যৌবনে দাও রাজটীকা' লেখাটি আমার খুব ভাল লাগল। খুব উজ্জ্বল ও শানিত। অবনের ভ্রমণকাহিনীটাও খুব সুন্দর হয়েছে আমারতো বোধ হচ্ছে তোমার কাগজ এইরকমভাবে যদি বছরখানেক চলে তাহলে বাংলাসাহিত্যকে নতুন শক্তি, গতি এবং রস দিতে পারবে। সবুজপত্রের উচিৎ হবে খুব একচোট গাল খাওয়া। *(প্রাগুক্ত, পত্র সংখ্যা ২৫, পৃষ্ঠা ১৭৮)*

সবুজপত্র যতদিন চালু ছিলো, রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত ছিলেন। ১৩২১-এর বৈশাখ থেকে ১৩২৭-এর মাঘ পর্যন্ত প্রতিমাসে নিয়মিত 'সবুজপত্র' প্রকাশিত হয়। এ পর্যায় সবুজপত্র প্রকাশের সংখ্যা ৮২। ১৩২৭-এর ফাল্গুন ও চৈত্র সংখ্যা একসঙ্গে প্রকাশিত হয়। ১৩২৮-এর প্রথম তিনমাস (বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়) সবুজপত্র প্রকাশিত হয়নি। শ্রাবণ সংখ্যা বের হয় 'সম্পাদকের কৈফিয়ত'সহ। এরপর ক্রমশ 'সবুজ পত্র, অনিয়মিত হতে থাকে। ১৩২৮-এর শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন সংখ্যার পর ছয় মাসে প্রকাশিত হয় তিনটি সংখ্যা। সংখ্যাগুলো এরকম কার্তিক-অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ-ফাল্গুন। প্রকাশিত হয় চৈত্র ১৩২৮ এবং বৈশাখ ১৩২৯ যৌথ সংখ্যা। এরপর প্রায় পাঁচ বছর (৪০ মাস) 'সবুজ পত্র' প্রকাশনা বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় পর্যায়ে 'সবুজ পত্র' প্রকাশিত হয় ১৩৩২-এর ভাদ্র সংখ্যা থেকে। চলে ১৩৩৪-এর আষাঢ় পর্যন্ত। এর মধ্যে ১৩৩৩-এর কার্তিক-অগ্রহায়ণ এবং ১৩৩৪-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় ও শ্রাবণ-ভাদ্র প্রকাশিত হয় যৌথ সংখ্যা হিসেবে। দ্বিতীয় পর্যায় সবুজপত্র প্রকাশে উদ্যোগ গ্রহণ ও প্রকাশিত হলে সে সংবাদ প্রকাশিত হয় 'দৈনিক আনন্দবাজার' পত্রিকায়। প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের সংবাদ 'ঘরে বাইরে' শিরোনামে ছাপা হয় ৬ আগস্ট ১৯২৫/২১ শ্রাবণ ১৩৩২ তারিখের পত্রিকায়। সংবাদটি ছিলো এরকম :

> 'সবুজপত্র',– আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাইতেছি যে, আগামী ভাদ্র মাস হইতে শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাহার সবুজপত্র আবার প্রকাশ করিবেন। প্রথম সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত 'চরকা' সম্বন্ধে একটি আলোচনা থাকিবে। সবুজপত্র একদিন বাঙ্গলার সাহিত্যক্ষেত্রে নূতন করিয়া শক্তির সঞ্চার করিয়াছিল। সবুজপত্রের অন্তর্ধানে তাহার অভাব সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই অনুভব করিতেছিলেন। আশাকরি– প্রমথবাবুর সম্পাদনায় সবুজপত্র আবার তাহার পূর্ব্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

দ্বিতীয় পর্বে সবুজপত্র প্রকাশিত হয় ১৩৩২-এর ভাদ্র সংখ্যা থেকে। এই সংবাদ প্রকাশিত হয় দৈনিক আনন্দবাজারপত্রিকার ১৮ আগস্ট ১৯২৫/২ ভাদ্র ১৩৩২ সংখ্যায়। 'যৎকিঞ্চিত' শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি এরকম :

> রসিক চূড়ামণি 'বীরবলের' সবুজপত্র বহুদিন বন্ধ থাকিয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা 'সবুজপত্র'কে সাদরে বরণ করিতেছি। কবি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা এবং চমকপ্রদ প্রবন্ধ 'চরকা' এ সংখ্যার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছে। 'সম্পাদকের কৈফিয়তে' শ্রীযুক্ত প্রমথনাথবাবুর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। তাঁহার শেষকথা এই যে, 'সবুজপত্র কারো উনুনে হাঁড়ি চড়াবার সাহায্য করবে না। বড়জোর উনুন ধরাবার কাজে লাগতে পারে'। বিজ্ঞ বহুদর্শী সম্পাদকের ব্যবস্থা হইলেও যে, 'সবুজপত্রে' উনুন ধরে না– ধরিবে না। তবে কাজে লাগাইবার সমস্যাই যদি দেখা দেয়, তাহা হইলে কেহ কেহ 'সবুজপত্র' দ্বারা নিরীহ জীব বিশেষ পালন করিতে পারেন।

১৩৩৪-এর জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় যৌথ সংখ্যা প্রকাশের পর 'সবুজপত্র' একবারেই বন্ধ হয়ে যায়। মুক্তচিন্তা, ব্যক্তি স্বাধীনতা, যুক্তিতর্ক, গণতন্ত্র চর্চা, তীর্যক অভিব্যক্তি প্রকাশ ও স্বাধীনচিন্তার প্রতিফলন ছিলো 'সবুজপত্রে'র মূল আদর্শ। সর্বোপরি বাংলা চলতি গদ্যের শিষ্টরূপ প্রদানে 'সবুজপত্র'র অবদান সর্বজনস্বীকৃত।

'সবুজ পত্র' পরিচালনায় প্রমথ চৌধুরী মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। পত্রিকা সম্পাদনায় তাঁর প্রজ্ঞা, ভাবনা এবং সৃষ্টির যথার্থতায় রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেকথা তিনি নানা স্থানে উল্লেখ করেছেন। ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে প্রমথ চৌধুরীর সবংর্ধনা উপলক্ষে 'সংবর্ধনা সমিতি' প্রমথ চৌধুরীর 'গল্প সংগ্রহ' প্রকাশের উদ্যোগ নেয় (প্রথম সংস্করণ ২০ ভাদ্র ১৩৪৮)। এই সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন :

> যখন তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত ছিলেন তাঁর পরিচয় আমার কাছে ছিল সমুজ্জ্বল। যখন থেকে তিনি সাহিত্যপথে যাত্রা আরম্ভ করেছেন আমি পেয়েছি তাঁর সাহচর্য এবং উপলব্ধি করেছি তাঁর বুদ্ধিপ্রদীপ্ত প্রতিভা। আমি যখন সাময়িক পত্র চালনায় ক্লান্ত এবং বীতরাগ, তখন প্রমথর আহ্বানমাত্র 'সবুজপত্র' বাহকতায় আমি তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রমথনাথ এই পত্রকে যে একটা বিশিষ্টতা দিয়েছিলেন তাতে আমার তখনকার রচনাগুলি সাহিত্য-সাধনায় একটি নূতন পথে প্রবেশ করতে পেরেছিল। প্রচলিত অন্যকোনো পরিপ্রেক্ষিণীয়র মধ্যে তা সম্ভবপর হতে পারত না। সবুজপত্রে এই একটি নূতন ভূমিকা রচনা প্রমথর প্রধান কৃতিত্ব। আমি তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করতে কখনো কুণ্ঠিত হই নি।

রবীন্দ্রনাথের এই যে 'নূতন ভূমিকা' তা হলো সবুজপত্রের গদ্যরীতি তথা ভাষারীতি। আর ভাষারীতি 'চলতি বাংলা' বা 'কথ্যবাংলা'। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গদ্য সাহিত্য ছিলো সাধুভাষা নির্ভর। তবে ক্ষীণ কণ্ঠে হলেও মাঝে মাঝে চলতি ভাষা প্রয়োগের দাবি উঠেছে। এর প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত 'মাসিক পত্রিকা'য়। এর প্রথম সংখ্যায় বলা হয়েছিল, যে ভাষায় আমাদিগের কথাবার্তা হয় তাহাতেই প্রস্তাবসকল রচনা হইবেক।

এই মাসিক পত্রেই প্রকাশিত হয় প্যারিচাঁদ মিত্র ছদ্মনাম টেকচাঁদ ঠাকুরের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর গদ্য সাধারণ্যে গৃহীত হয়নি। হয়ে রইলো 'আলালী বাংলা'; আর কালীপ্রসন্ন সিংহ-র 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১৮৬২) হলো 'হুতোমী বাংলা'। এর অন্যতম কারণ শিষ্ট চলতি গদ্য সৃষ্টির প্রয়াস তখনও শুরু হয়নি। ফলে আঞ্চলিকতাই চলতি ভাষাকে আড়ষ্ঠ করে রেখেছিলো। এই আড়ষ্ঠতা কাটিয়ে মৌখিক ভাষারীতিতে সাহিত্যরচনার প্রবক্তা 'সবুজপত্র'র প্রমথ চৌধুরী। 'সবুজপত্র'র কালেই এই রীতি দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। বলা যায় 'মাসিক পত্রিকা'র ঘোষণা বা সূচনাকে লক্ষ্যে পৌঁছানোর কঠিন এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করতে পেরেছেন প্রমথ চৌধুরী এবং সবুজপত্রগোষ্ঠী।

বাংলা ভাষা-সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ উঠে আসে। সবুজপত্রের পথ ধরেই রবীন্দ্ররচনায় চলতি গদ্যের প্রতিষ্ঠা। এর আগে ডায়রি ও চিঠিপত্রে রবীন্দ্রনাথ চলিত ভাষা ব্যবহার করলেও সাহিত্যক্ষেত্রে সাধুভাষাই ছিলো মূল ভিত্তি। লক্ষণীয় রবীন্দ্রগদ্যসাহিত্যে সাধু থেকে চলতিতে রূপান্তর একটি কালীক বিষয়। সময়টা ১৩২৬ বা ১৯১৯, অর্থাৎ সবুজপত্র প্রকাশের পাঁচ বছরের মাথায় এবং নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ছয় বছর পর। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধগ্রন্থ 'কালান্তরে'র কালেই এই পরিবর্তন। 'কালান্তর'-এর প্রথম পাঁচটি প্রবন্ধ সাধু ভাষায় রচিত। ষষ্ঠ প্রবন্ধ 'বাতায়নিকের পত্র' চলতি বাংলায় রচিত। 'বাতায়নিকের পত্র' রচিত হয় ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩২৬, আর প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'র আষাঢ় ১৩২৬ সংখ্যায়। 'কালান্তর'-এ সংকলিত এর আগের প্রবন্ধ 'ছোটো ও বড়ো' (রচনা ১৩২৪) সাধুবাংলায় রচিত ও প্রকাশিত। 'পয়লা নম্বর' চলতি ভাষায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটোগল্প। গল্পটির রচনাকাল আষাঢ় ১৩২৪। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্রে'র আষাঢ় ১৩২৪ সংখ্যায়। লক্ষণীয় গল্পগুচ্ছে সংকলিত এর আগের ছোটোগল্প 'তপস্বিনী' সাধুভাষায় রচিত। 'তপস্বিনী' প্রথম প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র'র জ্যৈষ্ঠ ১৩২৪ সংখ্যায়। এর পর রবীন্দ্রনাথ সাধুভাষায় আর কোনো ছোটোগল্প লেখেননি। তেমনি উপন্যাসের ক্ষেত্রে 'চতুরঙ্গ' (রচনা ১৩২১) সাধুভাষায় রচিত শেষ উপন্যাস। চলতি বাংলায় রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে' প্রথম প্রকাশিত হয় 'সবুজপত্র'-র ১৩২২-এর বৈশাখ থেকে ফাল্গুন– এই দশ পর্বে (অবশ্য সবুজপত্র ভাদ্র ও আশ্বিন যৌথ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হয়)। 'ছোটো ও বড়ো', 'তপস্বিনী' এবং 'চতুরঙ্গ' থেকে যে কথ্যবাংলারীতির প্রচলন, ক্রমে তা আরো গতিশীল এবং ঋদ্ধ হয়ে বাংলা গদ্যরূপের শিষ্ট রূপায়ণ ঘটে রবীন্দ্রনাথের হাতে। বলাবাহুল্য এর মূল ভীত্তি প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজপত্র'। •

বদিউর রহমান
অধ্যাপক ও সাংবাদিক
সভাপতি, বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী

প্রেমেন্দ্র মিত্র (৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪ – ০৩ মে ১৯৮৮)

প্রবন্ধ

প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঢাকার স্মৃতি

বিভূতিভূষণ মণ্ডল

আমি এখনও মনে মনে সূত্রাপুরের পোল দিয়ে গ্যান্ডেরিয়া চলে যাই, বুড়িগঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়াই নতুন বজরা কোথায় বেঁধেছে দেখবার জন্য, শুধু শুধুই ঢাকা স্টেশনে যাই কুত্তি গাড়োয়ানদের অননুকরণীয় গলায় অতুলনীয় সব রসের টিপ্পনি শুনতে। যেখানে যা দেখেছি শুনেছি করেছি তার সব ছবি এখনও আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বলভাবে স্পষ্ট। আমি কাগজিটোলার বাড়িটা চোখ বন্ধ করলেই দেখতে পাই। দেখতে পাই, লক্ষ্মীবাজারে আমাদের অক্সফোর্ড মিশন হোস্টেল আর তার সামনের রাস্তাটা। যেখানে বন্ধু ও সহপাঠী সুধীশ ঘটকের বাবা ঢাকার তখনকার সাবডিভিশনাল অফিসার সুরেশ ঘটকের কাছে বসে বহু সন্ধ্যা তাঁর ইংরেজিতে লেখা বৈষ্ণব কবিতা শুনে ও গলসওয়ার্দি ইয়েট্স প্রমুখ বিলেতের স্বনামধন্য সাহিত্যিকদের কাছে তাঁর পত্রালাপে সহযোগিতা করে কাটাতে হয়েছে। উয়ারীর সেই বিকেলে বিরাট বাড়িটা শুধু চোখে দেখতে পাই না, সন্ধ্যার পর শুধু হাততালি দিলেই ঝাঁকে ঝাঁকে যাদের মারা যায় উয়ারীর সেই বিখ্যাত মশকবাহিনীর গুঞ্জন যেন শুনতে পাই [নানা রঙে বোনা, প্রেমেন্দ্র মিত্র, পৃ. ৩৫৭-৩৫৮]

বাংলা সাহিত্যে কল্লোলযুগের বিশিষ্ট কবি-গল্পকার-ঔপন্যাসিক ও গীতিকার, উত্তর-তিরিশের আধুনিক সাহিত্য-আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের (৪.৯.১৯০৪-৩.৫.১৯৮৮) জন্ম ভারতের কাশীতে। জীবনের সিংহভাগ সময় কলকাতা শহরে কাটালেও তাঁর যৌবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটে পূর্ববাংলার ঢাকা শহরে। খেয়ালের বশে পূর্ববাংলা তথা ঢাকা শহর দেখার স্বাভাবিক কৌতূহল নিয়ে বেড়াতে এলেও প্রথম দেখার ভালোলাগা এবং ভালোবাসায় প্রেমেন্দ্র মিত্র এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ঢাকাতেই শিক্ষালাভের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

কলকাতার আটাশ নম্বর গোবিন্দ ঘোষাল লেনে বাড়িবাড়া নিয়ে মেস বসিয়েছিলেন পূর্ববাংলার ঢাকা শহরের জনৈক বিমল ঘোষ। নিজস্ব পরিমণ্ডলে তিনি টেনিদা নামে পরিচিত ছিলেন। টেনিদার মেসবাড়ির আবাসিক ছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। মেসের অন্যান্য সদস্যের তুলনায় যে-কোনো কারণেই হোক তার সাথে টেনিদার একটু বেশি মাত্রায় ঘনিষ্ঠতা ছিল। টেনিদা একবার প্রবল জ্বরে দুসপ্তাহের মতো প্রায় বেহুঁশ হয়ে কাটান। কিছুটা সুস্থ হলে টেনিদা একবার দেশের বাড়ি থেকে ঘুরে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। দেশ মানে পূর্ববঙ্গের ঢাকা, খোদ ঢাকা শহর। দুর্বল শরীরে একাকী টেনিদাকে ঢাকায় যেতে দেয়া উচিত নয় বলে প্রেমেন্দ্র মিত্র তার সঙ্গী হন। এই প্রথম প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঢাকায় আসা, পূর্ববঙ্গ দেখা। তাঁর ভাষায় : 'মাঝরাতে চাঁদপাল ঘাট থেকে দু'পাশে দুই তেরপাল ঢাকা গাধাবোট বাধা 'সুন্দরবন ডেসপ্যাচ সার্ভিসের' একটি স্টিমারে ঢাকা রওনা হয়ে গেলাম।' স্টিমার যাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতা নিয়ে, নানা ঘাট পথ জনপদ পেরিয়ে মানিকগঞ্জ থেকে ঘোড়ার গাড়িতে নারায়ণগঞ্জ এসে পৌঁছান। তারপর 'নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে ঢাকা আর সেখান থেকে ঢাকার বিখ্যাত ঘোড়ার গাড়িতে টেনিদার বাড়ি।' বাড়ির ঠিকানা : এগারো নম্বর কাগজিটোলা, সূত্রাপুর, ঢাকা। এই একই বছরে প্রেমেন্দ্র মিত্র তিনবার ঢাকা-কলকাতা যাওয়া আসা করেন এবং সব মিলিয়ে ঢাকায় পঁচিশ-তিরিশ দিনের মতো অবস্থান করেন। যে-কারণে তাঁর ঢাকায় আগমন এবং অবস্থান শেষাবধি সেই লক্ষ্য পূরণ না হলেও স্বল্পকালীন ঢাকা বাসের স্মৃতি প্রেমেন্দ্র মিত্রের জীবনে হিরন্ময় স্মৃতি হয়েছিল।

সূত্রাপুর অর্থাৎ টেনিদার কাগজিটোলা তখন একটি ঘিঞ্জি এলাকা। বাসিন্দারা অধিকাংশই মধ্যবিত্ত। বাড়িগুলোর সামনে নামমাত্র একটি রাস্তা-গলিপথ বলাই সঙ্গত। গলির দুধারে ময়লা আবর্জনার স্তূপ। বাড়িগুলো বেশির ভাগই প্রাচীন। জীর্ণ শীর্ণ। পলেস্তারা খসা। স্থানে স্থানে শ্যাওলার ছোপ। জানালা কপাটে রঙ পড়েনি যেন কতকাল। দেওয়ালে চুনকামের কথা যেন ভুলে গেছে বাড়ির মালিকেরা। টেনিদাদের বাড়িও এই বিবরণের ব্যতিক্রম নয়। অতি সাধারণ একতলা এই বাড়িতে ঢুকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বাইরের ঘরের দুপাশে সার দেওয়া দশটি কাঠের আলমারি ঠাসা বিপুল সংখ্যক বইয়ের সমাহার দেখে। এরপরে ধীরে ধীরে অপরিচয়ের দূরত্ব কাটিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে ঘনিষ্ঠ হলে প্রেমেন্দ্র মিত্র বাড়ির ভেতরের অংশে ঢুকেও দেখতে পান সব ঘরেই বই আর বই, বইভর্তি সারি সারি আলমারি। এই বইগুলো তার মনে প্রবল নেশা ধরিয়ে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল 'ভুলে যাওয়া হারিয়ে যাওয়া একটি ঐশ্বর্য ভাণ্ডার আবিষ্কার করা।' প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন : 'সত্যি কথা বলতে গেলে এগারো নম্বর কাগজিটোলা এইটি না হয়ে টেনিদার বাড়ি যদি অন্য কোথাও হতো তাহলে কলকাতার একটা শহরতলির শামিল তখনকার ঢাকা শহরের সঙ্গে আমরা অমন একটা প্রাণের টান গড়ে উঠতেই পারত না। আমার জীবনের ধারাটাই একটু অন্য পথে বইত বলেই মনে হয়।' এখানেই শেষ নয়। মুগ্ধ প্রেমেন্দ্র মিত্র আরও জানাচ্ছেন, 'এগারো নম্বর কাগজিটোলার বাড়িটা তাইতো অত ভাল লেগেছিল। ভাল লেগেছিল ঢাকা শহরটাই।'

টেনিদার বাবার নাম রাধারমণ ঘোষ। পেশায় শিক্ষক ছিলেন তিনি। তিনি ত্রিপুরার তখনকার মহারাজের প্রধান সচিব হয়েও কাজ করেছিলেন। ত্রিপুরা রাজ্য তথা রাজবাড়ির সাথে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক সৃষ্টির পেছনেও মূল ভূমিকা ছিল রাধারমণ ঘোষের। তিনিই ত্রিপুরা রাজ্যের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ করে সেখানে নিয়ে যান। রাধারমণ সারাজীবন বইপত্র ছাড়া আর কোনো বিষয় সম্পদ অর্জন করতে পারেননি। আর সেগুলোই রেখে গিয়েছিলেন পরিবারের জন্য। মূলত এই পরিবারের সূত্র ধরেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের ঢাকায় আসা, ঢাকাকে ভালোবাসা। ঢাকার সঙ্গে কলকাতার তুলনা করে তিনি লিখেছেন : 'কলকাতা অনেক বড়, অনেক তার ঐশ্বর্য-আড়ম্বর। কিন্তু তখনকার ঢাকা ছোট বলেই যেন অনেক বেশি অন্তরঙ্গ।'

প্রথমবার টেনিদার সঙ্গী হিসেবে ঢাকাভ্রমণ করতে কিংবা পূর্ববাংলা সম্পর্কে স্বাভাবিক কৌতূহল মেটাতে প্রেমেন্দ্র মিত্র ঢাকায় আসেন। কিছুদিন থাকার পর তিনি কলকাতা ফিরে যান। ঢাকা বাসের অভিজ্ঞতা তার চারপাশে একটি মুগ্ধতার আবেশ ছড়িয়ে রাখে। কলকাতার বিপুল বৈভবের মধ্যেও যেন তিনি ঢাকার অস্তিত্ব অনুভব করেন। কলকাতার বুকের মধ্যেই যেন হারিয়ে যাওয়া প্রেয়সীর মতো ঢাকাকেই খুঁজতে থাকেন। মাস কয়েক বাদে তিনি আবার ঢাকায় আসেন। টেনিদা ও তার ভাইয়ের একই সাথে বিয়ের আয়োজন করা হয়েছে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেই প্রেমেন্দ্রর ঢাকায় আসা। পরপর দুইবার ঢাকায় আসা এবং কিছুদিন এখানে অবস্থান করার কারণে প্রেমেন্দ্র মিত্রের কেন যেন মনে হলো, তিনি কলকাতা নয় ঢাকাতেই তার পরবর্তী ধাপের শিক্ষাজীবন শুরু করবেন। তিনি ডাক্তারি পড়ার সিদ্ধান্ত নেন। অবশ্য ঢাকায় তখন মেডিকেল কলেজ ছিল না, ছিল কলকাতার ক্যাম্বেলের মতো মেডিকেল স্কুল। তিনি মনে করলেন, চিকিৎসকের বিচার হয় তার কর্মদক্ষতা দিয়ে, ডিগ্রি দিয়ে নয়। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় পড়ার। ভর্তির প্রস্তুতি নিয়ে প্রেমেন্দ্র যখন ঢাকায় এলেন টেনিদা তখন কলকাতায়। ইতোমধ্যেই টেনিদার পরিবারের সাথে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি আন্তরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আত্মীয়ের মতো। ফলে টেনিদার ভাইয়েরা প্রেমেন্দ্রর ভর্তির ব্যাপারে সাহায্যে ত্রুটি করলেন না। তাদের চেষ্টায় প্রেমেন্দ্র মেডিকেল স্কুলে ভর্তির জন্য আবেদন করলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভালো নম্বর থাকার কারণে ভর্তিচ্ছুদের নামের তালিকার প্রথম দিকেই স্থান ছিল তার। কিন্তু কলকাতা থেকে পাস করা বলে, ঢাকার ছাত্রদের অগ্রাধিকার দেবার জন্য তাকে অপেক্ষমানদের তালিকায় রাখা হলো। অপেক্ষার ধৈর্য ছিল না প্রেমেন্দ্রর। টেনিদাদের সূত্রে পরিচিত একজন ডাক্তার কাম শিক্ষক প্রেমেন্দ্রকে ভর্তির আশ্বাসও দিয়েছিলেন। কিন্তু অনিশ্চিত অপেক্ষায় থাকার মানসিক সায় পেলেন না তিনি। সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন 'কলকাতা নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপ দরকার। বেশ, তাই থাকবে। ঢাকার কলেজেই পড়ব। আর ডাক্তার হওয়াই যখন উদ্দেশ্য তখন আর্টস নয়, সায়েন্স।'

ঢাকার জগন্নাথ কলেজটিই পছন্দ হলো তাঁর। কিন্তু সেখানেও কিছু জটিলতা ছিল। প্রেমেন্দ্র মিত্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থেকে পাস করেন জগন্নাথ কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। তারপর আবার আর্টস থেকে সায়েন্স বিভাগ পরিবর্তন করা। টেনিদার বাড়ি থেকেই

স্থানে স্থানে শ্যাওলার ছোপ। জানালা কপাটে রঙ পড়েনি যেন কতকাল। দেওয়ালে চুনকামের কথা যেন ভুলে গেছে বাড়ির মালিকেরা। টেনিদাদের বাড়িও এই বিবরণের ব্যতিক্রম নয়। অতি সাধারণ একতলা এই বাড়িতে ঢুকেই প্রেমেন্দ্র মিত্র মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন বাইরের ঘরের দুপাশে সার দেওয়া দশটি কাঠের আলমারি ঠাসা বিপুল সংখ্যক বইয়ের সমাহার দেখে

(বাঁ থেকে) বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কালিদাস রায়, তুষারকান্তি ঘোষ, প্রফুল্ল সেন, উমা রায়, অশোককুমার সরকার, রমাপদ চৌধুরী ও প্রেমেন্দ্র মিত্র

একজন জানালেন যে, জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ সত্যেন ভদ্রের সাথে দেখা করতে পারলে সমস্যার সমাধান হতে পারে। সত্যেন ভদ্র থাকতেন নয়াবাজারে। সেখানে পুরনো আমলের বেশ একটি বড় বাড়ির গেটের বাইরে সত্যেন ভদ্রের দেখা পেলেন তিনি। 'নেহাত ছোটখাটো রোগা পাতলা একরত্তি মানুষ, ব্যবহার অমায়িক এবং মধুর।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের দু-চারটে কথা শুনেই তিনি সবকিছু বুঝতে পারলেন। প্রেমেন্দ্রকে বিজ্ঞান বিভাগেই ভর্তির অনুমতি দিলেন তিনি। বিশ্ববিদ্যালয় পরিবর্তনের ফিও মাফ করে দিলেন। প্রেমেন্দ্র সেইদিনই ভর্তি হলেন জগন্নাথ কলেজে। যেহেতু এবার দীর্ঘ মেয়াদে তাঁর ঢাকায় বসবাস শুরু হবে সেহেতু তিনি টেনিদাদের বাড়ি থেকে লক্ষ্মীবাজারে অক্সফোর্ড মিশনে গিয়ে ওঠেন। এবং মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করেন যে, কলকাতা থেকে ঢাকায় পড়তে বসেছেন সেটা যেন কেবল খেয়ালের বশে নয় তা প্রমাণ করতে হবে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফলাফল অর্জনের মাধ্যমে। কলেজে ক্লাস, অধ্যাপকদের নিবিড় সান্নিধ্য, নতুন বন্ধুদের সাথে পরিচয় প্রভৃতি নানান বিষয় ঢাকার জীবনকে রঙিন করে তোলে। ঢাকাকে ঘিরে তাঁর স্বপ্ন-কল্পনা-ইচ্ছে দানা বাঁধতে থাকে। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন–

অবস্থা ও পরিবেশ তারই অনুকূল ছিল প্রায় সবদিক দিয়েই। প্রিন্সিপ্যাল সত্যেন ভদ্রের তো বটেই, ভাগ্যগুণে কলেজের আরও কয়েকজন অধ্যাপকের বিশেষ স্নেহভাজন হতে পেরেছিলেন। নিজের ডাক্তারি জীবনের ভবিষ্যৎটা এক রকম ছকেই ফেলেছি মনে মনে। জগন্নাথ কলেজ থেকে পাশ করে মেডিকেল স্কুল নয়, কোথাও কলেজে ঢোকবারই চেষ্টা করব। সেখান থেকে ডাক্তার হয়ে বেরিয়ে কলকাতা নয়, এ দিকেই কোথাও শুরু করব প্রাকটিস। তবে ঢাকায় নয়, নারায়ণগঞ্জে। কাগজিটোলার বাড়ির সকলের সঙ্গে ইতোমধ্যে নারায়ণগঞ্জ থেকে গহনার নৌকায় লাঙ্গলবন্ধের মেলা যেখানে হয় তারই কাছাকাছি বরেপাড়া গ্রামে গিয়ে কয়েক দিন করে থেকেছি। যাওয়া আসার পথে ধলেশ্বরীর ধারে বড় ভালো লেগেছে নারায়ণগঞ্জ শহরটা। ডাক্তারি পেশার সঙ্গে সাহিত্যের নেশা মিশেয়ে থাকবার পক্ষে একেবারে আদর্শ জায়গা বলে মনে হয়েছে [পৃ. ৩৪০]।

গরমের ছুটিতে দিন কয়েকের জন্য কলকাতায় গেলেন প্রেমেন্দ্র। গিয়ে উঠলেন সেই গোবিন্দ ঘোষাল লেনের মেসবাড়িতে। এক রাতেই 'শুধু কেরানি' নামে একটি গল্প লিখে পাঠিয়ে দিলেন 'প্রবাসী' পত্রিকার দপ্তরে। ঢাকায় ফিরে এসে অক্সফোর্ড মিশনের পাঠকক্ষে প্রেমেন্দ্র 'প্রবাসী' পত্রিকার অপেক্ষায় থাকেন গল্পটির নিয়তি জানার জন্য। তারপর হঠাৎ একদিন প্রেমেন্দ্রর সহপাঠী বিজয় বোসের কাছেই প্রথম প্রবাসীতে তাঁর গল্প প্রকাশের খবর পান। অবশ্য বন্ধুদের কেউ কেউ বিশ্বাস করেনি। তারা অবিশ্বাস নিয়ে বলেছে, গল্পের লেখকের নাম প্রেমেন্দ্র মিত্র হলেও সে অন্য কেউ। কেউ কেউ আবার সন্দেহ এবং বিশ্বাসের দোলাচালে দোল খেতে খেতে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে নানারকম জেরা করলেও তিনি সহসা ধরা দিতে চাননি। ব্যাপারটা নেহাত মজার বলে ঠাট্টা তামাশা করে উড়িয়ে দিয়েছেন। ঢাকায় তাঁর সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য, সুধীর ঘটক, ক্ষিতীন্দ্র সাহা, ভৃগু গুহঠাকুরতা, হিমাংশু সোম, প্রতাপ রায় প্রমুখ। এদের কাছে প্রবাসীতে গল্প প্রকাশের সত্যি খবরটা গোপন রাখা সম্ভব হয়নি। এই বন্ধুদের নিবিড় সান্নিধ্য প্রেমেন্দ্র মিত্রের নির্বান্ধব অনাত্মীয় ঢাকার জীবনকে মাধুর্যে ভরিয়ে দিয়েছিল। ঢাকা মানেই এই বন্ধুবৃত্ত। এই বন্ধুবৃত্ত মানেই ঢাকা। প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন–

এদের কথা মনে হলে গ্যান্ডেরিয়া, সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার, আর্মানিটোলা, উয়ারী, টিকাটুলি ইত্যাদি পাড়া সমেত বুড়িগঙ্গার ঘাট আর রমনার মাঠ নিয়ে আমার সেই সেদিনকার ঢাকা তার এক নিজস্ব রহস্যমায়া ছড়িয়ে মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। একদিক দিয়ে কিছুটা কলকাতার ছেলে হয়েও শহর হিসেবে প্রথম এই ঢাকাকেই ভালোবেসেছিলাম। আমার সেই বয়সের মনের কাছে বিশাল বিচিত্র জটিল কলকাতা যেন ঠিক ভালোবাসার মাপের ছিল না। ঢাকা-ই সেদিক দিয়ে ছিল আপনার করে নেবার মতো সুষম সীমার। সে ঢাকার কোনো কিছুই যেন খুব দূরের নয়। সমস্ত শহরটাকে তার সমস্ত জীবন-স্পন্দন সমেত যেন একত্রে পাওয়া যায়।... তখন এই ঢাকা শহরে আমাদের বন্ধুত্বের রঙও ছিল যেন আলাদা। অন্তত আমার মনে তখনকার দিনের স্মৃতি সেই ছাপই রেখে গেছে [পৃ. ৩৪৫]।

এরপরে বড়দিনের ছুটিতে কলকাতায় যান প্রেমেন্দ্র মিত্র। এইপর্বে কলকাতায় অবস্থানকালে বহুসংখ্যক সাহিত্যবন্ধুর সাথে দেখা, তাদের সাথে আড্ডা-আলোচনা, প্রবাসীতে গল্প প্রকাশের উত্তেজনা, নতুন নতুন লেখার ভাবনা প্রভৃতি বিষয় প্রেমেন্দ্র মিত্রকে যেন বেঁধে ফেলে আর কি। তারপরও 'মনের এই ঘোরলাগা আচ্ছন্নতা সত্ত্বেও ঠিকমতো পড়াশোনা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে ঢাকায় ফিরে' এলেন তিনি। কিন্তু এবারে তাঁর অক্সফোর্ড মিশনে থাকার জায়গা হলো না। মিশনের পরিচালক ফাদার ফসেট চমৎকার মানুষ। প্রেমেন্দ্রকে স্নেহও করতেন যথেষ্ট। প্রেমেন্দ্রর ধারণা, ইতোপূর্বে তার দু'টি কাজ হয়তো ফাদারের চোখে গর্হিত হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকবে। প্রথমত, অক্সফোর্ড মিশনে একদিন ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা তুলতে বাধা দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র–এমন খবর পৌঁছেছিল

ফাদারের কানে। ঘটনাটা এরকম : ব্রিটিশ রাজের কোনো একটি বিশেষ দিন ছিল সেদিন। এই উপলক্ষ্যে পতাকা তোলবার তোড়জোড় চলছিল। পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে মিশনের আবাসিকদের যোগদানের কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না। ফাদার ফসেটের প্রতিনিধি হয়ে মিশনের সবচেয়ে জ্যেষ্ঠ ছাত্র এই দায়িত্ব নিজে পালন করতেন অথবা কাউকে দিয়ে করাতেন তার তত্ত্বাবধানে। ১৯২০ সাল তখন। সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে। সেদিন যে সিনিয়র বোর্ডারের পতাকা তোলার দায়িত্ব ছিল তিনি নিরীহ ভালোমানুষ গোছের মনে হলেও বোর্ডারদের বিভিন্ন ত্রুটি-বিচ্যুতি গোপনে ফাদারের কানে তুলে দিতেন। বলা দরকার, এই সিনিয়র বোর্ডার তখন ছাত্র নন। লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে ছাত্রাবস্থার নিয়মনিষ্ঠা এবং আনুগত্যের সনদে হোস্টেলে থেকে একটু আধটু তদারকির কাজ করতেন। সেই সুযোগে তিনি সেবার নিজে ইউনিয়ন জ্যাক পতাকা না তুলে দায়িত্ব দিলেন এক জুনিয়র বোর্ডারকে। সে পতাকা তুলতে গিয়ে পতাকার খুঁটিতে রশিটি এমনভাবে জট পাকিয়ে ফেলে যে, ফাদার নেমে আসতে আসতে পতাকা তোলা সম্ভব হচ্ছিল না। সিনিয়র বোর্ডার তখন পতাকা-উত্তোলনকারী জুনিয়র বোর্ডারকে তিরস্কার করছিলেন। তখন প্রেমেন্দ্র মিত্র এসে তীব্রভাবে প্রতিবাদ জানান। ঘটনাটি ভিন্নখাতে প্রবাহিত হয়ে পতাকা অসম্মানের দায় চাপানো হয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের ওপর। অনেকেই প্রতিবাদে শামিল হলেও চিহ্নিত হয়ে রইলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সিনিয়র বোর্ডার যা বললেন সম্ভবত ফাদার তাই বিশ্বাস করলেন। দ্বিতীয়ত হোস্টেলের এক আবাসিক রাতুলের প্রতি আরেক আবাসিক সৌভিকের জুলুম জবরদস্তির প্রতিকার করতে গিয়ে রাতুলের পক্ষ নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন একটি পরিস্থিতির শিকার হলেন যে, তাকেই অপরাধী হিসেবে সাব্যস্ত হতে হয়েছিল। এই দু'টি ঘটনার কারণেই সম্ভবত তার অক্সফোর্ড মিশনে থাকার সুযোগ মিলল না।

এবার তাঁর থাকার জায়গা হলো 'বয়েজ হোম' নামে ছাত্রদের একটি নতুন হোস্টেলে। 'হোস্টেলটি খুলেছেন একজন ভূতপূর্ব রাজবন্দী দেশসেবক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল কলেজের ছাত্রেরা সেখানে থাকতে পারবে বলে হোস্টেলটি অনুমোদনও পেয়েছে।' অক্সফোর্ড মিশনের মতো অতটা সুযোগ সুবিধা না থাকলেও হোস্টেলটি নেহাত মন্দ ছিল না। কলকাতায় থাকাকালীন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে (১৯০৩-১৯৭৬) নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'আভ্যুদয়িক' নামে যে সাহিত্য-আসর শুরু করেছিলেন ঢাকাতেও একই নামে একটি সাহিত্য-বৈঠক বসাবার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু দু'চারটের বেশি বৈঠক বসতে পারেননি প্রথমত স্থানাভাব এবং দ্বিতীয়ত কাম্য সংখ্যক আগ্রহী সদস্যের স্বল্পতার কারণে। একবার বৈঠক বসেছিল প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহপাঠী বন্ধু অনিল ভট্টাচার্যের বাড়িতে। বৈঠক শেষে রাত্রির আহারে বসলে অনিল ভট্টাচার্যের মা খাবার পরিবেশন করতে করতে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার ঢাকা বাসের যাবতীয় তথ্য জেনে নেন। তারপর প্রেমেন্দ্রকে প্রস্তাব দেন হোস্টেল ছেড়ে তাদের বাড়িতে এসে থাকার জন্য। দুই বন্ধু মিলে একই সাথে থাকলে এবং পড়াশোনা করলে অনিলের কিছুটা উপকার হবে সেই জন্য মায়ের এই প্রস্তাব। অনিলের বাবা গুরুবন্ধুবাবুর সম্মতিও আদায় করেন অনিলের মা। প্রেমেন্দ্র মিত্র তল্পিতল্পা গুটিয়ে বয়েজ হোম থেকে চলে আসেন অনিল ভট্টাচার্যদের বাড়িতে। কিন্তু যে কারণে প্রেমেন্দ্রকে বাড়িতে ডেকে আনা অনিল সেই কারণের ধার দিয়েই যায় না। লেখাপড়া বিশেষত বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। তার মধ্যে কাজ করে এক শিল্পীসত্তা। সে ছবি আঁকে, বাঁশি বাজায়। তার ইচ্ছে আর্ট নিয়ে পড়ার। কিন্তু অনিল কিংবা তার মায়ের সাহস নেই অনিলের বাবাকে এই কথা বলার। শেষ পর্যন্ত সাহস সঞ্চয় করে, অনেক যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র সক্ষম হন অনিলের বাবার সম্মতি আদায় করতে। মনের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই তিনি সম্মতি দেন। এই অনিল ভট্টাচার্য পরবর্তীকালে চিত্রশিল্পী হিসেবে বেশ নাম করেন। বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' কাব্যের প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন অনিল ভট্টাচার্য

অনিল ভট্টাচার্যদের বাড়িতে থাকাকালীন কলকাতার 'বিজলী' পত্রিকা থেকে লেখা চেয়ে চিঠি পেলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। সাহিত্য এবং ডাক্তারি–এই দুইয়ের টানাপড়নে অস্থির হয়ে ওঠেন তিনি। একবার বড়ো হয়ে ওঠে সাহিত্যের নেশা, আরেকবার ডাক্তারির। কার সাথে গাঁটছড়া বাঁধবেন

বড় ভালো লেগেছিল নারায়ণগঞ্জ আর শীতলক্ষ্যা। নামটি যেমন মিষ্টি নদীটিও তেমনই। তখনও ঠিক করে ফেলেছিলাম ডাক্তারি পাশ করার পর আর কোথাও নয়, শীতলক্ষ্যার ধারে ওই নারায়ণগঞ্জের কোথাও চিকিৎসার আস্তানা পাতব

তিনি? 'বিজলী' পত্রিকার আহ্বান তাঁর ডাক্তার হবার সংকল্পকে একটু একটু করে টলিয়ে দিতে থাকে। তিনি লিখেছেন–

এরপর কলকাতা যাবার জন্য মন টেনেছে তবে ঢাকা যে খারাপ লেগেছে তা একেবারেই নয়। প্রথম বছর কলেজে পড়বার সময় ঢাকা থেকে কয়েকবার নারায়ণগঞ্জে বেড়াতে গিয়েছি। একবার পুজোর ছুটির সময় নারায়ণগঞ্জ থেকে গহনার নৌকায় এগারো নম্বর কাগজিটোলার বাড়ির পরিবারের সঙ্গে এক রাত দু'দিনের পাড়ি ব্রহ্মপুত্রের তীরে পুরনো খেতের ধারে বাৎসরিক মেলার জন্যে বিখ্যাত লাঙ্গলবন্ধের কাছের বীরপাড়া বলে একটি গ্রামেও এক হপ্তা কাটিয়ে এসেছি। বড় ভালো লেগেছিল নারায়ণগঞ্জ আর শীতলক্ষ্যা। নামটি যেমন মিষ্টি নদীটিও তেমনই। তখনও ঠিক করে ফেলেছিলাম ডাক্তারি পাশ করার পর আর কোথাও নয়, শীতলক্ষ্যার ধারে ওই নারায়ণগঞ্জের কোথাও চিকিৎসার আস্তানা পাতব। ডাক্তারির সঙ্গে সাহিত্যের দোটানায় পড়বার পরও সে সংকল্প বদল করিনি। ডাক্তারি আর পড়ি না পড়ি কলকাতায় সাহিত্যের জগতের হাওয়া একটু গায়ে লাগিয়েই আবার এখানেই ফিরব এই তখন ঠিক করে রেখেছি (পৃ. ৩৫৭)।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। এইযাত্রায় কলকাতায় গিয়ে আর ঢাকায় ফেরা হয়নি প্রেমেন্দ্র মিত্রের। অধরা মাধুরীর মতো ঢাকা শুধু স্মৃতির সঞ্চয় হয়ে থাকে তাঁর হৃদয়কন্দরে। ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার অনেক দিন পরে কোনো অলস সময়ের অসতর্ক মুহূর্তে তিনি ভাবতে থাকেন যৌবনের সেই সূত্রাপুর, লক্ষ্মীবাজার, আর্মানিটোলা, গ্যান্ডারিয়া, উয়ারী, টিকাটুলি, রমনা-স্মৃতি বিজড়িত সেই জায়গাগুলো পূর্বেকার সেই বাস্তবতায় আর নেই। পরিবর্তনের ঢেউ এসে পরিচিত চেহারাকে পাল্টে দিয়েছে। ফিরে এলেও ফেলে যাওয়া সেই ঢাকাকে তিনি আর খুঁজে পাবেন না। সে তখন কোথায় হারিয়ে গেছে। হারানো মানসীর মতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে বিভিন্ন ব্যক্তি সংগঠন বা রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকেও তাঁকে ঢাকায় আসার সাদর আহ্বান জানানো হলেও তিনি আসতে রাজি হননি। হয়তো খুঁজতে গিয়ে তিনি তাঁর চেনা ঢাকাকে হারিয়ে ফেলবেন। আশাভঙ্গের বেদনা তাঁর জন্য চরম পীড়ার কারণ হবে। তবু স্মৃতিরা সহসা পিছু ছাড়ে না। চলচ্চিত্রের দৃশ্যের মতো স্মৃতিরা একে একে জলছবি এঁকে মিলিয়ে যায়। বহুদূরের কোনো এক অদৃশ্যলোক থেকে শোনা যায় স্মৃতির পাখিদের কলগুঞ্জনা প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন–

সবচেয়ে স্পষ্ট ও মধুর হয়ে আছে টিকাটুলির সেই পঁয়ত্রিশ নম্বর বাড়িটা। উয়ারী থেকে শর্টকাটে আসবার জন্য রেললাইনগুলো পার হবার সময়ই পাড়াটা যে আলাদা ধরনের তা যেন টের পেতাম। রেললাইনের উয়ারীর দিকের বিরাট কয়েকটা বাড়ির বিস্তীর্ণ দেওয়ালে অম্লান্তক গজসিংহ গোছের অদ্ভুত ভাষায় বিজ্ঞাপনগুলোর অক্ষরগুলো এখনও যেন চোখে ভেসে ওঠে। লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌঁছলেই নির্জন রাস্তা আর ছাড়া ছাড়া বাড়িঘরগুলো যেন অন্য শহরের। রাস্তার লালমাটি, প্রত্যেকেরই সামনে কিছুটা বেড়ায় ঘেরা বাগান দিয়ে বাড়িগুলোর হাত-পা ছড়ানো চেহারা দেখে মধুপুরের কথাই মনে পড়ত। এরই মধ্যে একটি বাড়ির ছবি মনের মধ্যে একবারে গাঁথা। ঠিকানাটা আজও ভুলিনি, পঁয়ত্রিশ নম্বর টিকাটুলি (পৃ. ৩৫৮)।

বিভূতিভূষণ মণ্ডল
গবেষক ও প্রাবন্ধিক

* তথ্যসূত্র : নানা রঙে বোনা। প্রেমেন্দ্র মিত্র শতবার্ষিক সংকলন। সুরজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পাদিত)। মিত্র ও ঘোষ। কলকাতা। ১৪১০ ●

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩ জুলাই ১৮৯৮ – ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১)

প্রবন্ধ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আখ্যানের জগৎ

সরকার আবদুল মান্নান

বাংলা কথাসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল উনিশ শতকের প্রথমার্ধে। আরম্ভক্ষণের সেই সময়টি ছিল সংগঠনের যুগ–গদ্যের সংগঠন। তার সঙ্গে জড়িত হয়েছিল দেশজ ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব ও উত্তরণের প্রচেষ্টা। সেই সময় প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪–১৮৮৩) হাতে *আলালের ঘরের দুলাল* নামে যে আখ্যান জমাট বেঁধে ওঠে, সেখান থেকেই গণনা করতে হয় বাংলা কথাসাহিত্যের ঠিকুজি। উনিশ শতকে বাংলা নবজাগরণের অন্যতম ব্যক্তিত্ব প্যারীচাঁদ মিত্র। তিনি ছিলেন পাশ্চাত্য শিক্ষায় সুশিক্ষিত মানুষ। ফার্সি, বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। বিশেষ করে ইংরেজি ভাষায় বহু গ্রন্থ রচনা করে তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ইংরেজি ভাষায় রচিত তাঁর লেখা ছাপা হতো তৎকালীন *ইংলিশম্যান*, *ইন্ডিয়ান ফিল্ড*, *ক্যালকাটা রিভিউ*, *হিন্দু পেট্রিয়ট*, *ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া* প্রভৃতি পত্রিকায়। তিনি কলকাতা পাবলিক লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান হিসেবে অসংখ্য গ্রন্থ পাঠের সুযোগ পেয়েছিলেন এবং অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই যে বিপুল সৃষ্টির জগৎ, সেই জগতের মানুষজন, ঘটনানিচয়, কর্মযজ্ঞ, আবেগ-অনুভূতি, প্রেম ও বিরহ যে আদি ও অকৃত্রিম স্বরূপে উন্মোচিত হয়েছে, সে বিষয়গুলো অনালোচিত নয়। সমালোচকগণ তারাশঙ্করের জীবনাদর্শ ও জীবনতৃষ্ণা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে যে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ নিয়ে তারাশঙ্করের ভাবনার জগৎ রচিত হয়েছে, অনেক সমালোচক তার গুরুত্ব উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন

কিন্তু যখন তিনি *আলালের ঘরের দুলাল* গ্রন্থ রচনা করেন, তখন তিনি তাঁর সেই পাণ্ডিত্যের পরিচয় দেননি। এমনকি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিশেষ করে পাশ্চাত্য সাহিত্যের যে বিপুল ভাণ্ডারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল এবং সর্বত্র চলছিল পাশ্চাত্যকরণের জোয়ার, তিনি তার ধারেকাছে যাননি। অধিকন্তু মধ্যযুগের শেষ কবি ভারতচন্দ্রের (১৭১২–১৭৬০) *অন্নদামঙ্গল* কাব্যের আখ্যানের উত্তরাধিকার গ্রহণ করেছিলেন তিনি এবং কথ্যভাষা, দেশজ সংস্কৃতি এবং লোকজ জীবন ও দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি *আলালের ঘরের দুলালের* আখ্যানভাগ রচনা করেন। তিনি সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাকে তাঁর শিল্পের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালি জীবনের অরাজকতার বস্তুনিষ্ঠ চিত্র উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি পাশ্চাত্য রীতির নায়ক-নায়িকা ও প্রণয়ের ধারণা গ্রহণ করেননি। তিনি যে উপন্যাস-ভাষ্য রচনা করেছেন, তার মধ্যে বাঙালি জীবনের প্রাত্যহিকতাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন এবং তাঁর সেই রীতির মধ্যে এক ধরনের অনিবার্যতা ও অপরিহার্যতা তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কিন্তু উপন্যাস রচনায় তাঁর এই ধারা উত্তর সাধনায় স্থান পায়নি। কবিতার ক্ষেত্রে যেমন ঈশ্বরগুপ্ত হারিয়ে গেছেন, সেখানে আধুনিক কবিতার জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তেমনি কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রেও প্যারীচাঁদ মিত্রের *আলালের ঘরের দুলালের* অনুক্রমণ ও উত্তরসাধনা হয়নি। সেখানে আধুনিক কথাসাহিত্যের ইতিহাসে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেই পুরোধা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। কবিতা ও কথাসাহিত্যের এই দুটি ধারায় পাশ্চাত্যরীতির অনুক্রমণের ফলে একটি বিষয় লক্ষ করি যে, আমাদের বাংলা কবিতা ও কথাসাহিত্যের ইতিহাস মূলত পাশ্চাত্য শিল্প-সাহিত্যেরই দেশজ রূপায়ণ। এভাবেই চলছিল বাংলা কথাসাহিত্যের জগৎ। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যে আধুনিকতার এই ধারাই অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সচেতনভাবেই দেশজ ও পাশ্চাত্যরীতির মধ্যে এক ধরনের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। যে মহাকাব্যিক জগৎ নিয়ে তিনি তাঁর কথাসাহিত্যের সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছেন, তার মধ্যে তিনি বাখতিনের সাহিত্যতত্ত্বের সেই বহুল পরিচিত বহুস্বর বা পলিফনির উদ্ভব ঘটিয়ে এমন একটি জগৎ নির্মাণ করেছেন, যেখানে *আলালের ঘরের দুলালের* মানুষগুলোর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। একইসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত পাশ্চাত্য রুচির পরিচালিত জীবনের আকাঙ্ক্ষাও নানাভাবে উচ্চকিত হতে দেখা যায়। তারাশঙ্করের এই জীবনাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাঁর জীবনাভিজ্ঞতার নিবিড় সংশ্রব রয়েছে।

আমার সাহিত্য জীবন গ্রন্থে তারাশঙ্কর লিখেছেন, '১৩৩৫ সালের বৈশাখ থেকেই আমার সাহিত্য-জীবনের কালগণনা শুরু।' কালি-কলম পত্রিকার ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'পোনাঘাট পেরিয়ে' এবং শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের 'জোহানের বিয়া' গল্প দুটি বেরিয়েছিল। তারাশঙ্কর স্বীকার করেছেন, এই গল্প দুটি পড়ে তিনি যে গল্পটি লেখার অনুপ্রেরণা লাভ করেন, সেটি তাঁর প্রথম গল্প–'স্রোতের কুটো'। পরের বছর অর্থাৎ ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে 'পূর্ণিমা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় 'স্রোতের কুটো', আশ্বিন সংখ্যায় 'উল্কা' এবং একই বছর কল্লোল পত্রিকার ফাল্গুন সংখ্যায় 'রসকলি' গল্প প্রকাশিত হয়। আর ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয় লেখকের প্রথম উপন্যাস *চৈতালী ঘূর্ণি*। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে গল্পকার হিসেবে তারাশঙ্করের এই যে আবির্ভাব, এর ভিত্তি যে মাটিতে রচিত হয়, তা রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্রের কর্ষিত ভূমি নয়–বলা যায় প্যারীচাঁদ মিত্রের আরম্ভক্ষণের আরেক সূচনা। নতুন এই আরম্ভক্ষণেই তাঁর গল্পে মানুষের কোলাহল, স্বর, স্বপ্ন, সংবেদনা, সংক্ষোভ স্পষ্টভাবে ধ্বনিত হয়। একই সঙ্গে চলতে থাকে কবিতা রচনার প্রয়াস। কিন্তু আরম্ভতেই মন্থর হয়ে এসেছিল তাঁর সৃষ্টির প্রেরণা ও গতি। কিন্তু এও সত্য যে, সেই ১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত সময়ব্যাপী চলতে থাকে লেখক রূপে তাঁর প্রস্তুতি। অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় *কালের প্রতিমা বাংলা উপন্যাসের পঁচাত্তর বছর* (১৯২৩-১৯৯৭) গ্রন্থে লিখেছেন, 'এই পাঁচ বছর লেখক হিসেবে তাঁর প্রস্তুতির কাল। কংগ্রেস কর্মীরূপে দেশকে খুব কাছের থেকে জেনেছেন, জমিদার বংশের জামাতারূপে ধনতান্ত্রিক দাম্ভিকতার আঁচ পেয়েছেন, গ্রামের সন্তানরূপে মাটি ও মানুষকে ভালোবেসেছেন, শাক্ত-বৈষ্ণবের ক্ষেত্র রুক্ষ উদাস লালমাটির দেশকে জেনেছেন, ঠ্যাঙাড়ে-ডাকাত-বৈষ্ণব ও বৈরাগীদের চিনেছেন, বেদে-পটুয়া-মালাকার-লাঠিয়াল, চৌকিদার-ডাকহরকরা-কবিয়াল-সাপুড়ে-দরবেশ কত বিচিত্র মানুষকে জেনেছেন। সেই সঙ্গে যুক্ত হলো কারাজীবনের অভিজ্ঞতা। সাহিত্যেক্ষেত্রে পাঁচ বছর (১৯২৮-৩৩) বাদে যখন তারাশঙ্কর দেখা দিলেন, তখন তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন।' এরপর তাঁর একটানা লিখে যাওয়ার ইতিহাস। রচিত হয় গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, নাটক মিলিয়ে বিপুল এক সৃষ্টিভাণ্ডার।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই যে বিপুল সৃষ্টির জগৎ, সেই জগতের মানুষজন, ঘটনানিচয়, কর্মযজ্ঞ, আবেগ-অনুভূতি, প্রেম ও বিরহ যে আদি ও অকৃত্রিম স্বরূপে উন্মোচিত হয়েছে, সে বিষয়গুলো অনালোচিত নয়। সমালোচকগণ তারাশঙ্করের জীবনাদর্শ ও জীবনতৃষ্ণা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। বিশেষ করে যে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষ নিয়ে তারাশঙ্করের ভাবনার জগৎ রচিত হয়েছে, অনেক সমালোচক তার গুরুত্ব উন্মোচন করার চেষ্টা করেছেন। বীরভূম-বর্ধমান অঞ্চলের সাঁওতাল, বাগদি, বোষ্টম, বাউরি, গ্রাম্য কবিয়াল, কৃষ্ণ, বেদে, পটুয়া, মালাকার, লাঠিয়াল, জোতদার, চৌকিদার এবং হারানো ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাকার জনজীবন নিয়ে তিনি যে আখ্যানের জগৎ রচনা করেছেন তার স্বরূপও উন্মোচিত হয়েছে।

তারাশঙ্করের উপন্যাসে আমরা প্রথমত মানুষগুলোকে তাদের নিজ নিজ অবস্থানে ও স্বরূপে আবিষ্কার করি। আর এই পরিচয়ের একমাত্র মাধ্যম হলো ভাষা। প্রত্যেক ব্যক্তি যে স্বতন্ত্র ভাষিক জগতের অধিবাসী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সহজাত সৃষ্টিশীলতার গুণে এই সত্য

গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। ফলে ছোট-বড় সকল চরিত্র নিজস্ব একটি কণ্ঠস্বর ও সেই কণ্ঠস্বরের আলোকে একটি জগতের অধিবাসী ওঠে। তারা লোকজ জীবনে বসবাস করে। কিন্তু অনেকের মধ্যে থেকেও প্রত্যেকেই আলাদা। দু-একটি বাচন তাদের এমনভাবে চিনিয়ে দেয় যে, তাদের ভাষা একটি আলোকিত অধ্যায় খুঁজে পায়। গল্পে ও উপন্যাসে অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষের মুখের ভাষার ব্যবহার নতুন নয়। পূর্বেই বলেছি, প্যারীচাঁদ মিত্র ওই ভাষার সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় করিয়ে দেন। মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যেও মানুষের মুখের ভাষার ব্যবহার আছে। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চরিত্রগুলোর বাচনিকতায় ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে ধরতে চেষ্টা করেন। সেই চেষ্টা অনিবার্যতা লাভ করে এবং অন্য এক তাৎপর্যের উদ্ভাস ঘটায়।

ইতিহাস, ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি ও লোকপুরাণের যে জগৎ তারাশঙ্করের অন্বিষ্টি, তার স্বরূপ মাহাকাব্যিক। কিন্তু তিনি কখনো মানুষগুলোকে মহাকাব্যিক ও মহামানব করে তোলেননি। তার প্রতিটি মানুষ আপন স্বভাবে সমাজ সংস্থাপনা থেকে উঠে এসেছে এবং তারা নিজেদের মতো করে যে জীবন যাপন করতে চায়, সেই জীবনের পথেই হেঁটেছে কিংবা হাঁটতে পারেনি। তাঁর কথাসাহিত্যে যে লোকজীবন ও জনপদ তৈরি হয়েছে সেই লোকজীবন ঐতিহাসিকতার চেয়ে পৃথিবীর ইতিবৃত্ত প্রধান হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত আমরা লেখকের কণ্ঠস্বরের বাইরে তাদের মানুষগুলোর স্পষ্ট কোনো কণ্ঠস্বর শুনতে পাই না। এমনকি লেখকদের চেতনায় যে আভিজাত্যের আর্কেটাইপ তৈরি হয়েছিল, তার বাইরে চরিত্রগুলোকে বিচরণ করতে দেখা যায় না। কিন্তু তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় চরিত্রগুলোকে ছেড়ে দিয়েছেন। মানুষগুলো তাদের নিজেদের মতো করে বর্তমান ও ভবিষ্যতের নিরন্তরতার মধ্যে জীবনযাপন করার ফুরসত পায়। তাঁর কথাসাহিত্যে এই প্রক্রিয়াটি সহজভাবেই সমাধিত হয়। কিছুতেই বলা যায় না যে, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তার ভাবনাকে, সাহিত্যরুচিকে, বিশ্বাসকে কিংবা তার কোনো পরিকল্পনাকে আরোপ করেছেন। অধিকন্তু যে জীবন তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন, সেই জীবনকে শুধু তিনি সৃষ্টির প্রেরণা দান করেছেন এবং জীবন আপনা থেকে সৃষ্টি হয়ে উঠেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই প্রক্রিয়াটি বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। মনে হয়, দস্তইয়েভস্কি নয়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে রেখেই যেন বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব রচিত হয়েছে। বাখতিনের উপন্যাসতত্ত্ব সম্পর্কে মোহাম্মদ আজম লিখেছেন :

[জীবন ও জগতের] বিচিত্র উপাদানগুলো উপন্যাসে শৈল্পিক আকার পায়, সমগ্র উপন্যাসের বৃহত্তর শৈল্পিক কাঠামোর অধীনে বিন্যস্ত হয়, যেখানে সামগ্রিক কাঠামো অন্তর্গত আলাদা কাঠামোগুলোর প্রত্যেকটি থেকে স্বতন্ত্র। উপন্যাসের সামগ্রিক শৈলীর স্বাতন্ত্র্য অঙ্গীভূত কাঠামোগুলোর সমন্বয়ের উপর নির্ভরশীল, যে কাঠামোগুলো সমগ্রের অধীন, কিন্তু তাদের আপেক্ষিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ন থাকে। উপন্যাসের শৈলী খুঁজতে হবে এর অন্তর্গত 'শৈলীগুলো'র নিপুণ সমবায়ে। উপন্যাসের ভাষা এর অন্তর্গত 'ভাষাগুলো'র নিপুণ সমন্বয়। চরিত্রগুলোর স্বতন্ত্র বাচনই হোক, আর প্রাত্যহিক কথ্যবাচনই হোক–উপাদানগুলো প্রথমত এবং প্রত্যক্ষত সম্পর্কিত হবে অন্তর্গত কাঠামোগুলোর সাথে। এ উপাদানগুলোর শাব্দ-আর্থ-বাক্যিক শৈলী চিহ্নিত হবে ওই অন্তর্গত কাঠামোর সাপেক্ষে, যার সাথে এগুলো প্রত্যক্ষত সম্পর্কিত। একই সঙ্গে অন্তর্গত কাঠামোর অংশ থেকেই এগুলো সমগ্রের কাঠামো তৈরি করবে–সমগ্রের মুদ্রা চিহ্নিত করবে; অংশ নেবে সেই প্রক্রিয়ায় যাতে সমগ্র কাঠামোটি একক সামগ্রিকতা পায় আর তাৎপর্য উন্মোচিত হয়।

কথাসাহিত্য প্রসঙ্গে এর সংগঠন ও ভাষার স্বাতন্ত্র্য আর ঐক্যের যে সংহিতার কথা বলা হলো, তারাশঙ্কর তার ঘটনাগত ও বাচনিক অন্বয় সৃষ্টিতে সহজতর নীতি গ্রহণ করেছেন। এক কথায় বলা যায়, লেখকের প্রত্যক্ষতা, সময়ের অনুষঙ্গগুলোর যথার্থ উপস্থাপন এবং চরিত্রগুলোর স্বতন্ত্র বাচনের ব্যবহার তারাশঙ্করের কথাসাহিত্যের রীতির জগৎ বলে মনে হয়। আর বিষয়ের দিক থেকে তিনি বাঙালি সভ্যতার এক সন্ধিক্ষণের আখ্যান গ্রহণ করেছিলেন। খুব সংক্ষেপে সেই আখ্যান হলো, ক্ষয়িষ্ণু জমিদার পরিবারের আভিজাত্যের সঙ্গে উঠতি ব্যবসায়ী পরিবারের মর্যাদালাভের দ্বন্দ্ব, রাঢ় অঞ্চলের অপরিচিত ও অন্ত্যজ মানুষের জীবনচিত্র এবং গান্ধীবাদ ও বিপ্লববাদের আদর্শে পরিচালিত দেশসেবার পথনির্দেশ। এছাড়া যন্ত্রসভ্যতা ও কৃষিসভ্যতার মধ্যে দ্বন্দ্ব, গ্রামীণ সমাজের বর্ণ ও বৃত্তিগত ব্যবস্থায় শহুরে জীবনযাত্রা ও অর্থনীতির প্রভাবে পরিবর্তন, পঞ্চায়েতের শাসন, সংস্কার ও মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ব্যক্তির বিদ্রোহ, যুদ্ধের প্রয়োজনে গাছপালা দেব-দেউল উচ্ছেদ করে কৌম সমাজের অধ্যাত্ম-বিশ্বাসে আঘাত করা ইত্যাদি বিচিত্র বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৃষ্টির জগৎ। একটি উদাহরণ দিই : কবি উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র নিতাইচরণ। নিচু বংশে তার জন্ম। একদিন নিতাই গ্রামের সবাইকে অবাক করে দিয়ে কবি হয়ে ওঠে। সে কাজ করছিল কবিয়ালদের দোহার হিসেবে। কিন্তু গ্রামের পালাগানের আসরে এক প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালের অনুপস্থিতিতে তার সামনে সুযোগ আসে কবিয়ালের ভূমিকা গ্রহণ করার। এই সুযোগে সে গ্রামবাসীকে নিজের কবিয়াল পরিচয় জানিয়ে দেয়। অভিজ্ঞ কবিয়াল মহাদেবের কাছে সে হেরে যায় বটে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য সফল হয়। বাবুরা রীতিমত অবাক হয়ে যায়। বলে 'ডোমের ছেলে পোয়েট!' নিতাইয়ের পারিবারিক পেশা ছিল ডাকাতি। এমনকি মায়ের অনুরোধ বা মামার শাসনের পরেও সে পড়াশোনা ছেড়ে ডাকাতির দলে নাম লেখায়নি। অধিকন্তু সে ঘরবাড়ি ছেড়ে স্টেশনে গিয়ে থাকে। এখানেই তার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয় স্টেশনের মুটে রাজার। নিতাইয়ের ওপর রাজার ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল অগাধ। নিতাইকে সে ডাকত ওস্তাদ বলে। রাজারই এক আত্মীয়কে ঠাকুরঝি বলে ডাকত নিতাই। বিবাহিত ঠাকুরঝি রোজ এসে দুধ বিক্রি করে যেত। মেয়েটা কৃষ্ণকায়। তাই গ্রামের লোকজন তো বটেই, রাজাও তাকে নানা কথা শোনাত। কিন্তু এই মেয়েটার জন্যই নিতাইয়ের মাথায় একটা পদ তৈরি হয়–'কাল যদি মন্দ তবে চুল পাকিলে কান্দ কেনে?' জীবনের সব জায়গায় অপমান পাওয়া ঠাকুরঝি এই পদ শুনে আন্দোলিত হয়। আর নিতাইয়ের মনে, অসম্ভব জেনেও, ঠাকুরঝির জন্য গভীর প্রেম জন্মায়। একপর্যায়ে ঘটনা জানাজানি হলে নিতাই গ্রাম ছেড়ে চলে যায় এবং যুক্ত হয় ঝুমুরদলের সঙ্গে। এই দল অশ্লীল গান-বাজনা করে, নাচে। এর বাইরে তারা মূলত দেহোপজীবিনী। নিতাই ক্রমশ তার নিজের ভেতরকার কবিয়ালের সত্তাকে চেপে রেখে এই দলের মতো করেই গান রচনা করে। এখানে সে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। এ সময় তার সঙ্গে পরিচয় হয় বসন্ত বা বসন নামে এক নারীর। বসনের মধ্যে সে ঠাকুরঝির ছায়া দেখতে পায়। দুজনের মধ্যে গড়ে ওঠে নিবিড় সখ্য। এক সময় বসন্ত যৌনরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। শোকে কাতর হয়ে ঝুমুরদল ছেড়ে দেয় নিতাই। সে কাশীসহ নানা স্থান ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোথাও শান্তি পায় না। অগত্যা সে ফিরে যায় নিজ গ্রামে। রাজার কাছ থেকে জানতে পারে ঠাকুরঝি বেঁচে নেই। নিতাই গ্রাম ছাড়ার পরে সে উন্মাদ হয়ে মারা যায়। গভীর হতাশায় নিতাই প্রশ্ন করে–'জীবন এত ছোট ক্যানে?'

এই উপন্যাসে নিতাই, রাজন বা রাজা, ঠাকুরঝি, বসন্ত বা বসন ছাড়াও আরো কয়েকটি চরিত্র আছে। এরা হলো তারণ মণ্ডল, দীপ্রপদ ও মাসি। এইসব চরিত্র নিয়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় জীবনের যে ভূগোল রচনা করেছেন তার বেদনার দিকটাই প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। সাধু ভাষার বুননের মধ্যে কথ্য ভাষার আস্বাদ ও আত্যন্তিক জীবনতৃষ্ণার যে জগৎ রচিত হয়েছে, তার ভেতরে আছে চর্যাপদীয় জীবনের নৈঃসঙ্গ্য থেকে শুরু করে মধ্যযুগের পদাবলি সাহিত্যের চিরায়ত বিরহবোধের আলেখ্য। প্রভু, প্রকৃতি, প্রণয়–ইত্যাকার অভিধার মধ্যে মিলনের যে আকাঙ্ক্ষার ইতিহাস রচিত হয়েছে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সূচনালগ্নে, তারই বিচিত্র মাত্রা ও মাত্রান্তর ঘটেছে *কবি* উপন্যাসে। এ ছাড়া বহুস্বরের যে ধারণা আমরা লাভ করি বাখতিনের সাহিত্যতত্ত্বে, সেই বহুস্বর এই উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্য ও কোমলতার মধ্যে উচ্চকিত হয়ে ওঠে। আর এমনই এক সর্বগ্রাসী সংহতির মধ্যে এবং বৈপরীত্য ও ঐক্য সাধনার মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্যের জগৎ রচিত। এই ধারার উত্তর সাধনা বিরল। •

সরকার আবদুল মান্নান
গবেষক, প্রাবন্ধিক ও শিক্ষাবিদ

ছোটগল্প

যুগলবন্দি

পলাশ মজুমদার

দিন দিন বদলে যাচ্ছিলাম আমি। বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছিল প্রতিটি দিন। নিজের কাছে ক্রমশ অচেনা হয়ে উঠছিলাম। এক একটি ঘটনা আমাকে ছুড়ে ফেলছিল এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। ধূসরতার আবরণে ঢেকে যাচ্ছিল সকাল দুপুর সন্ধ্যা রাত। শূন্যতার ঘেরাটোপে আটকা পড়ছিল সব; অর্থহীনতায় হারিয়ে যাচ্ছিল শব্দ ও বর্ণ। পৃথিবীজুড়ে নেমে আসছিল বিষণ্নতার কালো মেঘ। মিশে যাচ্ছিলাম অন্তহীন অন্ধকারে।

আমি গান করতাম। অথচ আমার চৌদ্দগোষ্ঠীর কেউ কোনো দিন গান করেনি। গান দূরের কথা, সংগীতসংক্রান্ত কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িত ছিল না কখনো; এমনকি ছিল না কাব্য কিংবা শিল্প-সাহিত্যচর্চার ধারেকাছেও।

দুই

ক্লাস ফোরে পড়াকালীন আমাদের কাছাকাছি টিনশেড বাড়ি নির্মাণ করেন বিনোদ চক্রবর্তী। একজন গুণী শিল্পী। আগে তাকে চিনতাম না, চেনার কথাও নয়; তবে অনেকের কাছে তার নাম শুনেছি। তার সম্পর্কে জানত বয়োজ্যেষ্ঠরা

প্রশংসা যেমন ছিল, তেমনি ছিল নিন্দা।
একদিন শুনতে পেলাম, তিনি আর গ্রামের বাড়িতে থাকতে পারছিলেন না। প্রতিবেশীর সঙ্গে জমিসংক্রান্ত বিরোধই এর কারণ। বিরোধটি বেশি দূর এগোনোর আগেই তিনি সহায় সম্পদ বিক্রি করে শহরে চলে আসেন; হয়ে যান আমাদের প্রতিবেশী।

আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরে বিনোদ চক্রবর্তীর নামডাক ছিল। তিনি দেখতে যেমন ছিলেন সুদর্শন তেমন অমায়িক ছিল তার ব্যবহার; জাতি ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মানুষকে সহজে আপন করে নিতেন; ছিল না আপন-পর ভেদজ্ঞান। শিশুদের প্রতি তার স্নেহ-ভালোবাসা ছিল অন্তহীন। এককথায় বলতে গেলে তার গুণের সীমা ছিল না। আর এসব কারণে তিনি সব বয়সী ও শ্রেণি-পেশার মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পেতেন।

কেবল আমাদের শহর নয়, আশপাশের জেলা-উপজেলা শহরেও তার নাম ছড়িয়েছিল। সংগীতগুরু হিসেবে ছিল সুখ্যাতি। তালিম নেওয়ার জন্য দূরদূরান্ত থেকে অনেক শিক্ষার্থী তার কাছে আসত। তা ছাড়া শহরের সব ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তার অংশগ্রহণ ছাড়া ছিল প্রায় অসম্ভব। তিনি থাকতেন অনুষ্ঠান পরিচালনার নেতৃস্থানীয় অবস্থানে। মধ্যমণিও বলা যায়।

একটি বিষয় খেয়াল করতাম, বিনোদ কাকা প্রতিদিন সকালে গানের রেওয়াজ করতেন। আমার ঘুম ভাঙত তার রেওয়াজ শুনে; মুখস্থ হয়ে যায় পূরবী ভৈরবী থেকে শুরু করে প্রতিটি রাগ; বিলাবল, খাম্বাজ, আশাবরী, ইমন একে একে আমার দখলে আসে। সত্যি বলতে, আমি গানের প্রেমে পড়ে যাই; অক্টোপাসের মতো জড়িয়ে ধরে সুর। বলা বাহুল্য, এভাবে আমার সংগীতের কান তৈরি হয়।

অন্য সব বিষয়ে আগ্রহ থাকলেও পড়াশোনায় আমার একদম মন ছিল না। লেখাপড়াকে বিরক্তিকর মনে হতো; লেখাপড়া যে আবিষ্কার করেছে তার মুণ্ডুপাত করতাম প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায়। আমি বিচরণ করতাম নিজস্ব ভুবনে; সেখানে ছিল কেবল গান আর গান। এজন্য ছোটবেলায় বাবার হাতে মারও কম খাইনি। তবু মন এতটুকু দমেনি; বরং দিনে দিনে আরও ঝুঁকেছিলাম গানের প্রতি।

তখন নবম শ্রেণিতে পড়ি; শীতের এক পূর্ণিমা-সন্ধ্যায় লুকিয়ে লুকিয়ে কাউকে কিছু না জানিয়ে বিনোদ কাকার বাসায় গেলাম। গানের জন্য নাকি সরস্বতীর জন্য জানি না, বিনোদ কাকাকে প্রণাম করে সরাসরি বললাম, আমাকে গান শেখাবেন।

অনুরোধ জানিয়ে করজোড়ে বললাম, আপনি অন্য কারও বাড়িতে হলেও শেখার ব্যবস্থা করে দিন।

আমার বারবার অনুরোধে তিনি কিছুটা টলে উঠলেন। ভেতরে ভেতরে প্রীত মনে হলো। অকস্মাৎ তিনি হারমোনিয়াম আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে কিছু একটা শোনাতে বললেন।

তখন ইমন রাগটা এমনভাবে বাজালাম তিনি তৎক্ষণাৎ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তুই পারবি। একই সঙ্গে জানতে চাইলেন, এটা কীভাবে সম্ভব হলো?

বললাম, আপনিই আমার সংগীতগুরু।

বিস্তারিত শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন; আমার মাথায় রাখলেন আশীর্বাদের হাত।

বন্ধু পঙ্কজ মল্লিকের বাসায় বিনোদ কাকা আমাকে গান শেখাতে শুরু করলেন।

আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরে বিনোদ চক্রবর্তীর নামডাক ছিল। তিনি দেখতে যেমন ছিলেন সুদর্শন তেমন অমায়িক ছিল তার ব্যবহার; জাতি ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে মানুষকে সহজে আপন করে নিতেন; ছিল না আপন-পর ভেদজ্ঞান। শিশুদের প্রতি তার স্নেহ-ভালোবাসা ছিল অন্তহীন

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার গান শেখার সাদৃশ্য খুঁজে পাই। শুনেছি তাঁর দাদা-দিদিরা যখন বাড়ির বাঁধা ওস্তাদ ও গুরুদেবের কাছে গান শিখতেন, তিনি আড়ি পাততেন দরজার ফাঁকে, কখনো সামনে যেতেন না; অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে সামনে বসিয়ে গান শেখানো যেত না; আড়ালে বসে গান শিখেছেন। রবিঠাকুর আত্মজীবনীতে তাঁর গান শেখার কাহিনি ব্যক্ত করেছেন এভাবে।

বিনোদ কাকার বাজানো রাগ গভীর মনোযোগে শোনার অভিপ্রায়ে বিছানা না ছেড়ে পড়ে থাকতাম। তার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শুয়ে শুয়ে রেওয়াজ করতাম। এমনকি সন্ধ্যাবেলায়ও আমি বইয়ের দিকে তাকিয়ে পড়ার ভান করে চুপ থাকতাম। বিনোদ কাকার শিক্ষার্থীদের তালিম শুনতাম আর মনে মনে সেসব আওড়াতাম; অথচ আমাকে পড়তে দেখে খুশি হতেন মা।

কখনো বিনোদ কাকার মেয়ে সরস্বতীর রেওয়াজের শব্দও কানে আসত; সেসবও আমার প্রায় আয়ত্তে চলে আসে। একই সঙ্গে আমি ডুবতে থাকি। অতলান্ত জলে যেন ডুবতে থাকি। আর খারাপ রেজাল্ট নিয়ে এক এক করে ডিঙাতে থাকি ক্লাস।
সরস্বতী একই স্কুলে আমার এক ক্লাস নিচে পড়ত। লেখাপড়ায় খুব ভালো। রূপ-গুণে সে ছিল অদ্বিতীয়া; আমি তার রূপে-গুণে মুগ্ধ ছিলাম। সরস্বতীর কণ্ঠে নজরুল সংগীত, বিশেষত, আমায় নহে গো/ ভালোবাসো শুধু ভালোবাসো মোর গান–আমার ভালো লাগত।

তিন

এসএসসি পরীক্ষা দিয়ে আমি তখন অনেকটা স্বাধীন। বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দেওয়া কিংবা গানের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণের জন্য রাতে বাইরে থাকার অনুমতি পেয়ে গেলাম। বন্ধুদের মধ্যে আমার সমঝদার বেড়ে যায়; যখন-তখন যেখানে-সেখানে গান গাইতে অনুরোধ করত সবাই। আমিও সবার মন রক্ষার চেষ্টা করতাম। এভাবে শিল্পী হিসেবে আমার নাম ছড়াতে থাকে।

বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে কাটালেও তালিম নিতে ও রেওয়াজ করতে আমার ভুল হতো না। সব কাজ একদিকে আর গান অন্যদিকে। একমাত্র গানের জগতে থাকার সময় সব ভুলে থাকতাম; কারও কথা মনে থাকত না; গান ছিল আমার সার্বক্ষণিক ধ্যানজ্ঞান যেন গানের জন্যই জন্মেছি। সবকিছু মিলে কখনো মনে হতো আমি পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মানুষ। সুখের ডানায় ভর দিয়ে সারাক্ষণ উড়ে বেড়াতাম।

আমার উত্তরোত্তর উন্নতি দেখে বিনোদ কাকা ভীষণ খুশি। তিনি অন্যদের কাছে আমার প্রশংসা এমনভাবে করতেন যা শুনে লজ্জায় মরে যেতাম। তার আনন্দ দেখে ও প্রশংসা শুনে গান শেখায় আমার উৎসাহ আরও বেড়ে যায়। একদিন গল্পের ছলে বললেন, তুই অনেক বড় হবি। প্রত্যুত্তরে কিছু না বলে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম। চোখের কোণে চিকচিক করে উঠল জল। তখন তিনি আমাকে বুকে টেনে নিলেন। গুরু-শিষ্যের এই মনোগত ঐক্য আমাকে আরও দূরে হাতছানি দিয়ে ডাকল।

সময় গড়াতে গড়াতে কলেজ পাস করলাম। পাশাপাশি সরস্বতীও। অসুস্থতার কারণে এক বছর ড্রপ দেওয়ায় হয়ে পড়লাম ওর সহপাঠী। একই বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হওয়ার সুবাদে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে। এদিকে কলেজ ছাড়াও বিভিন্ন প্রোগ্রামে যৌথ অংশগ্রহণ চলতে থাকল যথারীতি।

বিনোদ কাকা যত প্রোগ্রামে যেতেন, সবখানে আমার আর সরস্বতীর উপস্থিতি ছিল বাধ্যতামূলক। শ্রোতারা আমার আর সরস্বতীর ডুয়েট গান শোনার জন্য উদগ্রীব থাকত; দর্শকের অনুরোধে চলত একের পর এক গান। খুশি হয়ে প্রচুর টাকা দিতেন শ্রোতারা। দেশের বিভিন্ন জায়গায় গান গাইতে যেতাম; আর ছড়াতে লাগল আমাদের দুজনের নাম।

ইতোমধ্যে টেলিভিশনের একটি চ্যানেলের সংগীত প্রতিযোগিতায় আমি প্রথম স্থান অধিকার করলাম; সরস্বতী দ্বিতীয়। এজন্য অনেকের ঈর্ষার পাত্র হলাম; আর বিনোদ কাকা হয়ে পড়লেন অনেকের চক্ষুশূল, যদিও তিনি কারও কথায় কর্ণপাত করতেন না।

তিনি নিজের মনমতো আমাদের তৈরি করতে লাগলেন। নিন্দুকেরা আড়ালে আবডালে আমার সঙ্গে সরস্বতীর নাম জড়িয়ে বিভিন্ন কথা রটাতে থাকল। বন্ধুদের কাছে এসব শুনতে পেতাম। সরস্বতীও হয়তো বন্ধু-বান্ধবীর মুখে নানা কথা শুনত, তবে আমরা এই বিষয়ে আলাপ করতাম না।

সরস্বতী কি আমাকে ভালোবাসত? মনে হয় না। তবু ধরে নিয়েছিলাম যে সে আমাকে ভালোবাসে। গোপনে। আর আমি? আমার মনের সরোবরে সরস্বতী ফল্গুধারার মতো বইলেও কখনো মুখ ফুটে প্রকাশ করিনি। কিছুটা ভয়ে কিছুটা সংকোচে। কখনো মনে হতো সরস্বতীর মনোযোগ অন্যদিকে। সম্পর্ক যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য মনের কথা চেপে রাখতাম। কিংবা বিনোদ কাকা যদি জানতে পারেন হয়তো কষ্ট পাবেন, ভাববেন আমি বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছি।

সরস্বতী কি আমাকে ভালোবাসত? মনে হয় না। তবু ধরে নিয়েছিলাম যে সে আমাকে ভালোবাসে। গোপনে। আর আমি? আমার মনের সরোবরে সরস্বতী ফল্গুধারার মতো বইলেও কখনো মুখ ফুটে প্রকাশ করিনি। কিছুটা ভয়ে কিছুটা সংকোচে। কখনো মনে হতো সরস্বতীর মনোযোগ অন্যদিকে। সম্পর্ক যাতে নষ্ট না হয়, সেজন্য মনের কথা চেপে রাখতাম

চার

একদিন আমাদের শহরে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায়; কোনো ধরনের পূর্বাভাস ছাড়াই। ক্ষণিকের জন্য আকাশ ভীষণ কালো হয়ে ওঠে। অনেক সময় মেঘ সরে গেলেও সেবার সরল না। এই ঝড় প্রাকৃতিক নয়, মনুষ্যসৃষ্ট। লন্ডভন্ড হয়ে যায় সব।

কোথা থেকে এত অচেনা লোক শহরে প্রবেশ করেছিল, বুঝতে পারছিলাম না। সন্ধ্যা থেকে একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছিল শহরজুড়ে। রাতে কিছু একটা ঘটতে পারে, সবাই টের পাচ্ছিল। ভয়ে আতঙ্কে মানুষজন পালাতে থাকে।

সকালবেলায় জানতে পারলাম মধ্যরাতে অনেক কিছু ঘটে গেছে; দৌড়ে বিনোদ কাকার বাড়িতে গেলাম। ঘরে কেউ নেই। দরজা-জানালা খোলা। ওলটপালট হয়ে পড়ে আছে জিনিসপত্র। কিছু ছড়ানো-ছিটানো। লুণ্ঠিত হয়ে গেছে ঘরের মূল্যবান জিনিসপত্র। উল্টে পড়ে আছে ভাঙা হারমোনিয়াম, তবলা।

মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। বুক ফেটে যায়। মনে হলো কেউ আমার মাথায় হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করেছে। গগনবিদারী চিৎকার দিয়ে উঠলাম; চারপাশের মানুষ দৌড়ে এলো। কেউ কেউ গায়ে মাথায় হাত বুলায়। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম আমি। তারপর কী হয়েছিল কিছু মনে নেই।

পাঁচ

মাসখানেক পর বিনোদ কাকা কোথা থেকে আমাদের বাড়িতে উদয় হলেন। চেহারা বিধ্বস্ত। মুখের চোয়াল ভাঙা। চোখ লাল টকটকে। একদম চেনা যাচ্ছিল না। আমাকে বুকে জড়িয়ে হু হু করে তিনি কেঁদে উঠলেন। এমন অবস্থায় নিজেকে সামলাতে পারিনি। পাশে দাঁড়িয়ে মাও কাঁদলেন। প্রতিবেশী, যারা আমাদের বাড়িতে জড়ো হয়েছিল, তারাও অশ্রু ধরে রাখতে পারেনি।

এক পর্যায়ে প্রশ্ন করলাম, কাকা, সরস্বতী কোথায়?

ওরা সবাই আগরতলায়। আমার ভাইয়ের বাড়িতে রেখে আসছি। তিনি জানালেন।

সরস্বতীকে একবার দেখতে চাই। আমাকে নিয়ে যাবেন। অনুরোধের স্বরে বললাম।

সে তো সম্ভব নয়। তিনি বললেন। তার চোখে জল টলমল করছিল।

কেন কাকা? জানতে চাইলাম আমি।

আমার প্রশ্নে বিনোদ কাকা বিব্রতবোধ করেন। মনে হলো কিছু লুকাতে চাইছেন। বারবার অনুরোধ ও চাপে তিনি যা বললেন, তাতে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এই খবর শোনার আগে আমার মরণ হলো না কেন?

ছয়

সেই রাতে পালানোর সময় সরস্বতী সম্ভ্রম হারিয়েছিল দুষ্কৃতকারীদের হাতে। সেযাত্রায় রক্ষা পেলেও আগরতলায় যাওয়ার সপ্তাহ খানেক পর সে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। ওই সময়টাতে সে কারও সঙ্গে কোনো কথা বলত না। বন্ধ করে দিয়েছিল নাওয়াখাওয়া; তার মুখের দিকে তাকানো যেত না।

কাকার কথা শুনে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

এই এক মাসে আমি এমনিতে শুকিয়ে চুপসে গেছি। যে দেখে সে আমাকে বলে, তোর কী হয়েছে? কোনো উত্তর দিতে পারি না।

সেদিন কেবল সরস্বতী নয়, নিজেও নিজেকে ছেড়ে দিলাম। বুঝতে পারলাম, আমাকে দিয়ে আর গান সম্ভব নয়। সরস্বতীর সঙ্গে বিচ্ছেদ, তার দেশত্যাগ ও আত্মহত্যা, গান ছেড়ে দেওয়া আমাকে ধীরে ধীরে নিয়ে যায় অন্ধকার জগতে। নষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে মিশে বখে যেতে লাগলাম। দ্রুত বদনাম ছড়িয়ে পড়তে লাগল। অনার্সের চতুর্থ বর্ষে পড়াশোনা ছেড়ে দিলাম। অভুক্ত থাকা, নিদ্রাহীন রাতযাপন, মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান ও মাদকাসক্তি, অসৎ সঙ্গ আমাকে একটু একটু করে মৃত্যুর দুয়ারে নিয়ে যায়।

যমে-মানুষে টানাটানির মধ্যে শেষ চেষ্টা হিসেবে পরিবার থেকে আমাকে বেঙ্গালুরুতে পাঠানো হয়। সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে যখন লড়ছিলাম, তখন সরস্বতী এক মধ্যরাতে শয্যাপাশে এসে দাঁড়ায়। আমার মাথায় হাত রেখে বলল, তোমার পাশে চিরজীবন থাকব বলে দূরে সরে এসেছি। আমি তো তোমারই। চলো, স্বর্গে বসে একসঙ্গে গান গাইব।

ভয়ে চোখ খুলতে কাউকে দেখতে পেলাম না। পাশে বসা মাকে ঝাপসা দেখলাম। মা আমার বুকে হাত রেখে বলল, খোকা, বুকে কি বেশি ব্যথা হচ্ছে?

উত্তর না দিয়ে চোখ বুঁজে ফেললাম। তলিয়ে গেলাম গভীর ঘুমে।

তখন আবার সরস্বতী এলো। আমার হাত ধরে বলল, তোমাকে নিতে এসেছি। একা একা একটুও ভালো লাগছে না। গান ছাড়া কি আমাদের চলে? তুমি পাশে না থাকলে আমি কি একা গান গাইতে পারি? •

পলাশ মজুমদার
কথাসাহিত্যিক

দেবদাস আচার্য

সপ্তপদী

৩০৬
সিকিভাগ পেলাম
বারোআনা অপ্রাপ্ত রইল
মানুষ বলেই মনে হয়
আত্মা অতৃপ্ত থেকে যায়

প্রকৃতিতে এমন তো নয়

ঔষধিগাছেরও অধম
মানব জীবন

৩০৭
কামনা-বাসনার শেষ নেই
বয়স বাড়তে বাড়তে শেষ সীমানায়
এখনো তো মোহমুক্তি হলো না আমার
আজীবন ছেঁড়া জালে মাছ ধরলাম

ভবিতব্যে কী আছে ওপারে
কে বা জানে
বৈতরণী পার হতে ঘাটে বসে আছি

মজিদ মাহমুদ

উমা

মা তোর পুতুলগুলি গড়ায় আঙিনায়
পুত্র ছিলাম তখন দেখি নাই
কন্যা হয়ে যখন গেলে ফেলে
বুঝতে পেলাম আমি ছিলাম পুতুল মায়ের ছেলে
মা তো আমার মাটির ঢেলা ছাড়া
মাটির পুত্র আমি মাতৃহারা
কে আমাকে পেয়েছিল নদীর কাদা-পাঁকে
ঘুম ভেঙে যায় একটি মধুর ডাকে
যে খুঁজেছে রাত্রি ও দিন একটি পুতুল ছেলে
তুই ছাড়া আর কোন পাষাণী এমন যাবে ফেলে
তবু রাখলি কেন পুতুল
এ যে তোর ইচ্ছেকৃত ভুল
শোবার-কালে যখন ঘরে আসি
পুতুল আমার মা নয় জানি, হয়তো হবে মাসি
মায়ের সাথে এই মাটি মা ছিল খেলাচ্ছলে
মা গিয়েছে চলে
তুমি আছ শুধু ইতস্তত উমা
চোখের জলে হৃদয় থেকে এইটুকু দে চুমা
মায়ের চেয়ে মাসির দরদ নয় তো বেশি জানি
তবু মা গিয়েছে বাপের বাড়ি, মাসির চরণখানি
সরণ জেনে আছি বলে পুতুলপূজক নই
মা যে আমার মায়ের থানে থাকবে অবশ্যই।

জিললুর রহমান

পেপার ওয়েট

পেপার ওয়েট কাগজের বেদনা বোঝে না
চেপে থাকে ভারী বোঝা পাতলা পৃষ্ঠার পরে
কাগজের বুকের ভেতরে থাকা শব্দগুলো
কত কষ্ট পুষে রাখে বুকে
কত কান্না কুঁকরে কুঁকরে মরে কাগজের পাতার ভেতরে
পেপার ওয়েট খুব প্রস্তরসুলভ
কিছুতেই মমতা বোঝে না
কাগজের ভেতরে রয়েছে
উড়ে উড়ে বেড়াবার সাধ
কাগজ কুঁচকে কেউ কতোবার হাওয়াই জাহাজ বানিয়েছে
কত কাগজের পৃষ্ঠা মুচড়ে ভেসেছে নৌকা জলে
এসব বোঝে না জগদ্দল
অথর্ব নিরেট এই পেপার ওয়েট
পেপার ওয়েট উড়ে বেড়াবার খেয়াল মানে না
পৃথিবীর সমস্ত আকাঙ্ক্ষাগুলো
চাপা দিয়ে রাখে পেপার ওয়েট

কাগজ জড়িয়ে যদি ধরে ওই পেপার ওয়েট
কাগজের কান্নাগুলো লেপ্টে যাবে
নির্বোধ পেপার ওয়েটের বুকে
তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বুঝি ঢুকতে পারবে ভাষা
সেদিন তবে পেপার ওয়েটের আর কোনো কাজ নেই
কাগজের বেদনাকে নিরন্তর আগলে রাখা ছাড়া

জয়শীলা গুহ বাগচী

ঘুমের গন্ধ

আলতো স্বাদ নিতে নিতে
কখন যেন অজানা সামুদ্রিক আলো
হাড়ে মজ্জায় সময় সারণীতে জিভ রাখে
আকাশি রঙের স্নায়ুতে
জন্ম গুনে গুনে একটা সম্পূর্ণ সন্ধে
লীলায়িত হতে থাকে চোখের বাতাসে
করমচা রঙের জীবন ফুটে থাকে দীর্ঘ রাস্তায়
যে যার নিজের হাত ধরে
পেরিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আলো
যে যার মতো বাসন্তী রঙ আঁকছে ছায়াপথে
ঘর দুয়ারে জ্বলে উঠছে প্রাগৈতিহাসিক তারা
ঘুমের গন্ধ ছড়িয়ে যাচ্ছে
ক্রমশ

সীমান্ত হেলাল

কিছু কিছু দুঃসময়

জীবনে আলো আসে–আলো যায়;
তবু তার কি বা দায়
এ অন্ধকার ঘোচাতে!

পাল্টে যাওয়া জীবন কিংবা ওলট পালট যাপনে;
হাজারো ব্যবচ্ছেদ ঘটায়–সময়ের করতল!

ভাগ্যের রকমফেরে সংকটগুলো পরিসংখ্যান খোঁজে
মুষ্ঠিবদ্ধ হস্তরেখায়...

অথচ; সময়ের কাটায় ভর করে
নিজেকে তাড়িয়ে বেড়ায়
কিছু কিছু দুঃসময়...!

আলফ্রেড খোকন

কাতরতা

হৃদয়ে রেখেছে হাত
হৃদয়ে তো হাত রাখা যায় না;
সে কিভাবে যেন রাখে!
একমাত্রার ভিতরে দ্বিতীয় মাত্রা যোগ করে
একদিন একান্ত হয়ে ওঠে;

এই যে তোমাকে আমারও হয়,
বলা হয় না
আমাকেও তোমার হয় কিনা
এই মুষল বৃষ্টিতে আজও তা জানি না;

স.ম. শামসুল আলম

পরীক্ষিত মেরুদণ্ড

মেঘ তার তুলাদণ্ড ছড়িয়ে দিলে
আমার মেরুদণ্ড সোজা হয়।
ঘাড়ে বইতে পারি বিনাবাক্য–বৃষ্টি।
মাথা আগের মতোই তেমাথা স্বভাব।
আজকাল রোবটের মতো কাজ করছে মস্তিষ্ক-জরায়ু।
অনবরত ঝরছে আকাশকুসুম সরিষার তেল আর
ভবানিপুরের আষাঢ়ে মধু।

আমাকে মৃত্যু-দরিয়ায় ছেড়ে দিলে
মহোল্লাসে সাঁতরাতে পারি লক্ষ-কোটি বর্ষ।

পলাশ দে

পাল্টামার

বিপ্লব ভাঙা দিন
আমি অন্ধ অন্ধ খেলি
রক্তদান শিবিরের নল কোনো মানচিত্র হয়ে
কোথায় লুঠ হলো
কানাঘুষো নামিয়ে রাখি
তুমি, বলো... শুনি গল্প
সেবারে নাকি ফসলে পাক ধরার আগেই
ছেয়ে গেছিল বহিরাগত চলাচল
থমথম ছায়া ছায়া নিচু নিচু

আলো নেভানো চোখ
আমরা পাল্টামার খেলি... খেলতেই থাকি

অরুণাভ রাহারায়

রায়মাটাং

ভুলতে বসেছি আমি তোমার ঠিকানা।
নদী জল মাঠ। ভাঙা এক ব্রিজ ছিল। আর কিছু নুড়ি।
পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধোঁয়া ওঠা মেঘ ও গুহার সীমানা।

হঠাৎই আসছে ভেসে বাঁশির আওয়াজ...
এমনই তো ভোর ছিল কিছুদিন আগে
রাস্তার বাঁকে বাঁকে যেটুকু হারিয়েছিল মন।
বিষণ্ণ পাথরের দেশে।

একপাশে কাঠের বাংলো আর অন্যদিকে বাতাসের ঢেউ।
ভুলতে বসেছি সেই রাতজাগা চাঁদ।
ঠান্ডা আবহ থেকে দাঁড় ঠেলে মাঝি আসে অফুর বেলায়।
জলের গভীরে লেগে হাতের বৈঠায় জেগে ওঠে ঝিকিমিকি আলো।

পাহাড়ের পথ ঘেঁষে তিনটি বাইক দাঁড়াল...

সাফিনা আক্তার

অধ্যায় দুই

সে এবং আমি মোট দুই পৃষ্ঠা
দুটি অধ্যায়, একটি সরল তরল!
অন্যটি যৌগিক কঠিন
পাঠ বাসনায় ছুঁলাম–খুলে গেল পরতে পরতে
মুষ্টিমেয় অক্ষর শুধু যুক্তবর্ণসকল–
তবুও খুলছে রং–জবার রং
দেখলাম পানপাতার সবুজ লেগে আছে মুখে
পাঠের কথায়–মুখে নিলেই রঙিন দুনিয়া
তার কথার ভেতরে যুগল আপেলের বন!
আঙুলের স্পর্শে আরষ্টতা বাড়ছিল।
বলল ভয় পেও না–এটা তো সাফা-মারুওয়া
আমি এর সৌন্দর্য ভাঙব না।

শ্যাম পুলক

আপেল ধরনের ফুল

তাল না মিলিয়ে
মেলাচ্ছ আপেল
আপেল ধরনের ফুল

মাছ উড়ছে তার
কাঁটার রোদে
বিড়াল পোহাচ্ছ একা

জাল না গুটিয়ে
গুটাচ্ছ নদী
ছায়া ধরনের আকাশ

খাঁচা উড়ছে তার
পাখির বোধে
পালকে পালকে বিষাদ

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ – ১ নভেম্বর ১৯৫০)

প্রবন্ধ

আধ্যাত্মবাদ ও বিভূতিভূষণ

হামিম কামাল

বিভূতিভূষণীয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধ্যাত্মবাদ গড়পরতা ধর্মীয় আধ্যাত্মবাদ থেকে ভিন্ন। আমাদের জানাশোনায় যে ধর্মগুলো আছে, তাদের দুটো অংশ। ব্যাবহারিক রূঢ় অংশ আর আলংকারিক কোমল অংশ। আধ্যাত্মবাদ দ্বিতীয় অংশে পড়বে। যেখানে স্বার্থে ধর্মকে কুঠার হিসেবে চালাতে হয়, সেখানে মানুষ ধর্মীয় অনড় নীতিমালা নিয়ে প্রস্তুত। আর যে অঞ্চলগুলো শাসনের আওতার বাইরে, উপেক্ষা করা যায় কিন্তু অবজ্ঞা করা যায় না, সেই জায়গাগুলো মানুষের সুবাসিত ও সুভাষিত কথার অঞ্চল।

সেটুকু স্থান আধ্যাত্মিকতার

ধর্মের এই আধ্যাত্মের অংশটুকু তুলনামূলক মানবিক। আর অনড় নীতির অংশটুকু 'পাশ'-বিক। অর্থাৎ পাশ বা বাঁধনের গিঁটগাঁটরাই নীতির অংশে মূল ভূমিকা রাখে।

অলংকার যেমন খুলে রাখলে শরীরের কোনো ক্ষতি নেই এবং বিপদে তুলে রাখাই নিরাপদ, মানুষ ধর্মের আধ্যাত্মিক অংশকেও যেন করে তুলেছে তাই। একে খুলে রাখলে মানুষ জ্যোতিহারা হয় না কারণ মানুষের নিজস্ব জ্যোতি আছে, তাতে কাজ চলে যায়।

আর একে থাকে তুলে রাখলে ক্ষেত্রবিশেষে কাজের সুবিধা হয় কারণ, অধ্যাত্ম তখন স্বার্থচিন্তাকে দুর্বল করে তুলতে পারে না, এবং আবার সময়ে বর্ম হিসেবে কাজে আসে।

কখনো কখনো তাই নীতির চেয়ে জ্যোতি–অর্থাৎ আধ্যাত্মজ্যোতি অনেক বেশি রাজনৈতিক। পলিটিক্যাল। যা 'পাশ' ছিল না, যা ছিল মুক্তি, সেই অধ্যাত্মকে মানুষ এভাবে 'পাশ' করে তুলছে। যা ছিল না ধর্মের অলংকার, ছিল দেহ, তাকে মানুষ অলংকার করে তুলেছে।

ঠিক এমন অবস্থায় বিভূতিভূষণকে একটা বিপাশা নদী বলে মনে হয়। এ নদীতে যে স্নান করে, সে পাশমুক্ত হয়। তাকে আধ্যাত্ম স্পর্শ করে। এবং সেই আধ্যাত্ম গড়পরতা ধর্মীয় আধ্যাত্ম নয়।

ছিল খরস্রোতা এক নদী পুত্রশোকসন্তপ্ত বশিষ্ঠকে পাশমুক্ত করল, তাই হলো বিপাশা। মানুষ যেদিন ধর্মে আধ্যাত্মবাদের রূপ বদলে দেওয়ার তীব্র অনুতাপে আত্মহত্যা করতে চাইবে, বিভূতিভূষণ নামের বিপাশা নদীটি সেদিন তাদের পাশমুক্ত করবে। তার প্রাণ বাঁচাবে, তাকে শান্তি দেবে। নতুন লক্ষ্য দেবে।

একটু আগে বলেছি, বিভূতিভূষণের আধ্যাত্মবাদ গড় আধ্যাত্মবাদ নয়। তাহলে তার স্বরূপ কেমন?

আমি আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে যেটুকু পেয়েছি, তাতে মনে হয়েছে, সেই আধ্যাত্মবাদ প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের তুলনায় আরো অনেক বেশি প্রাকৃত ও বহুত্ববাদী।

কেন তাকে বলছি প্রাকৃত। কেন তাকে বলছি বহুত্ববাদী। হলে সুবিধাই-বা কী, নাহলে অসুবিধাটা কোথায়।

প্রকৃতিকে তো আমরা অনেকটা জেনেছি। দেখেছি সে তার মৌলিক উপাদানগুলোর একটা সরল সমন্বয়ে প্রথম প্রাণ সৃষ্টি করেছিল। আর একে একে অসংখ্য প্রাণ সৃষ্টি হলো। বেশ। প্রকৃতি তো যন্ত্রের তাগাদায় চলে না। চলে মন্ত্রের তাগিদে। যন্ত্র এক লাখ নকশায় হুবহু একই সমন্বয় ঘটাতে পারে। এ হলো তার দক্ষতা। প্রকৃতি দক্ষ নয়, প্রকৃতি ব্রহ্ম। তার এক লাখ নকশায় হুবহু একই সমন্বয় ঘটে না। প্রকৃতির প্রতিটি সমন্বয় অনন্য। ভিন্ন।

যে কারণে 'দেবযান' উপন্যাসের আধ্যাত্মবাদ আর 'দৃষ্টিপ্রদীপ' উপন্যাসের আধ্যাত্মবাদ দুটোই প্রাকৃত, কিন্তু এক নয়। আর আরণ্যকের আধ্যাত্মবাদ এই দুইয়ের ভেতর যেটুকু মিল, সেটুকু ছাপিয়ে আরো বিচিত্র।

অনেক সরল মিলে জটিল তৈরি হয়। 'দেবযান' উপন্যাসের আধ্যাত্মবাদ তুলনামূলক সহজ আধ্যাত্মবাদ। এরপরও তা চেনা ধর্মের গ্রন্থনা থেকেও জটিল। এবং অত্যন্ত সহজ পথে জটিল।

আলাপে যাওয়ার আগে আমার অতীতস্মৃতি আর বোঝাপড়ার খানিকটা বলার লোভ সামলাতে পারছি না।

আমি প্রথম তারুণ্যে যখন 'দেবযান' পড়ি, ক'পাতা পড়েই নামিয়ে রেখেছিলাম।

'ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্ ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে'

মনে হচ্ছিল, আত্মার এ কাল্পনিকতাকে প্রশ্রয় দিয়ে লেখা কোনো বই পড়ে কেন আমি সময় ক্ষেপণ করছি?

তখন আমি ফ্রেডারিখ অ্যাঙ্গেলসের কথাটিকেই বেশি গ্রহণযোগ্য মানতাম। আত্মা মূলত বিভ্রম। এ হলো উত্তম সমন্বয়ের ফল। অর্থাৎ যখনই কোনো গঠন তার শ্রেষ্ঠ সমন্বয়টা পাচ্ছে, সেখানেই 'প্রাণ' জেগে উঠছে। এটাই আত্মার ধারণা দিয়েছে মানুষকে।

অথচ এখানে সমন্বয়টাই প্রধান। মানুষ যখন নিখুঁৎ যন্ত্রমানব তৈরি করবে, তখন তার ভেতর আত্মা পশে দেবে? তা তো নয়। সেখানে সে স্রেফ উত্তম সজ্জাটা নিশ্চিত করবে। আর চলবে বিদ্যুৎ, আর থাকবে জ্বালানি। মানুষের শরীরও জৈব বিদ্যুতে, জৈব জ্বালানিতে এভাবেই চলছে।

পৃথক কোনো আত্মার ভূমিকা অসার। আর আত্মা অসার হলে অসার হয়ে পড়ে বর্ণিত গোটা পরলোকজগৎ। সেই পরলোকের কষ্টকল্পনা আমি কেন পড়ব?

কোনো ধর্মগ্রন্থে যদি বিশ্বাসও না থাকে, তো তার সাহিত্যরস উধাও হয়ে যায় না। সেখান থেকে নেওয়ার থাকে। কিন্তু সেই নেওয়ার জন্যে যে মন লাগে, তা আমার ছিল না।

প্রসঙ্গত বলি, রসয়ানবিদ জন ডাল্টন ছিলেন আত্মায় বিশ্বাসী। 'আত্মার যেহেতু অস্তিত্ব আছে', তা নিশ্চয়ই বস্তু বিশেষ। এবং যেহেতু তা বস্তু বিশেষ, তারও নির্ঘাৎ পরমাণুও আছে; যাকে বলা যায় 'আত্মা পরমাণু'। ডাল্টনের কথা।

আত্মা-পরমাণুর অস্তিত্ব নিয়ে জন ডাল্টনের আন্তরিক খাটুনি কালের কিরিচে কাটা পড়েছে। কাটা যা পড়েনি, তা হলো 'ন হন্যতে'-শক্তির সংরক্ষণশীলতা নীতি। এই নীতি যেন কিছু বলতে চায়। যে কথা আমার পরে মনে হলো।

শক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নেই। শুধু রূপবদল আছে। অতএব শাক্ত মানুষের দেহ নাশ হলো। কিন্তু তার ভেতরকার শক্তিটি মরল না, সে কেবল মুক্ত হলো। এদিকে শক্তি রূপান্তরযোগ্য শরীর হলো 'মাটি' যে মাটি সে আদিতে ছিল।

যদি বিশ্বাস নাও করি, কোথাও একটা ঐক্য আছে। বিপুলা রহস্যময় বিশ্বে এই ঐক্যগুলোই আমাদের সূত্র। যে কারণে বিজ্ঞানকেই আমি ধর্ম মানি। তবে মস্তিষ্কের বিজ্ঞান তো কল্পনাকে সমর্থন করে। যা কিছু শিল্প, যা কিছু সাহিত্য, তা মস্তিষ্কের অর্থাৎ মনের পরম বন্ধু। এও তো সত্য!

অতএব 'দেবযান' আমি আবার হাতে তুলে নিয়েছিলাম এবং এক যুগ পর।

পরলোকের চেনা উপকরণগুলো ব্যবহার করে বিভূতিভূষণ এক ঐশ্বর্যময় স্বর্গ তৈরি করেছেন, ঠিক। কিন্তু স্বর্গের সেই জগৎ কিন্তু সনাতনী পরলোক নয়। যদিও বিবরণে মিল আছে। এমনকি মুসলমান-খ্রিষ্টান-ইহুদিরও পরলোক নয়। নয় কারণ, সেই জগতের যাঁরা জাগতিক, তাঁরা প্রত্যেকে সনাতনী নন বা ম্লেচ্ছও নন। এখানেই জটিলতা। এখানেই মাধুর্য, এখানেই বিভূতিভূষণ, বিভূতিভূষণ। ধার্মিক হয়েও তিনি মুক্তমনা।

তাঁর স্বর্গ যেমন বিশ্বাসীর, তেমনই অবিশ্বাসীরও। 'দেবযান' উপন্যাসে একজন নিরীশ্বরবাদীও স্বর্গের অত্যন্ত উচ্চস্তরে আছেন, যিনি জগতের বস্তুধর্মে আস্থাশীল। এ কি বিস্ময়কর নয়?

বিভূতির পরলোকে বাস্তবের যতীন, বাস্তবের পুষ্পেরা আছে। সঙ্গে পুষ্প পাহাড়ের ওপর অপরূপ বিষণ্ন সুন্দর যে মানুষটিকে দেখছে তিনি ভিনদেশি। সেখানে এমন অস্তিত্বের সঙ্গেও দেখা হয়, যারা কিনা আদতে মানুষ ছিলেন না। মহাজগতের অন্য কোনো বাস্তবতার অপর কোনো প্রাণী।

আমি বিস্ময়ে ও আনন্দে স্তব্ধ হয়ে যাই যখন দেখি, স্বর্গে আছেন সীতাও এবং সীতা দেবী নামে সত্যিই কেউ ছিলেন, তিনি এখন স্বর্গে আছেন, বিভূতিভূষণের বর্ণনা এমন নয়। বরং এমন, যতীন ও পুষ্কের যে সীতার সঙ্গে দেখা হয়, তিনি বাল্মিকীর কল্পনা। এই কল্পনা সৃষ্টিগুণে আর আবেগে এতটাই বাস্তব যে, স্বর্গে তিনি একজন ব্যক্তি হিসেবে স্থান পেয়েছেন। যেন বাস্তবের কেউ মৃত্যুর পর স্বর্গে গিয়ে এসমেরালদাকে দেখতে পেল।

'দেবযান' উপন্যাস আমি যে একটি যুগ পর আবার হাতে তুলে নিয়েছিলাম, সেজন্যে প্রকৃতিকে চিরদিন ধন্যবাদ দেবো। ভাষার সৌন্দর্য আর গল্পের জাদুময়তার কথা থাক। এখানে আলাপ তো কেবল আধ্যাত্মিকতা নিয়ে করছি। এই আধ্যাত্মের যে চিরনবীন প্রকাশ আমি বিভূতিভূষণে দেখতে পেলাম, তা আমার তৃষ্ণা মিটিয়েছে।

২.

লেভি, তুমি নীচ কে বলে? তুমি ভগবানের সন্তান...

এবার আসি দৃষ্টিপ্রদীপের কথায়। এই বইটিতে বিভূতিভূষণ তাঁর ধর্মদর্শন বোধহয় সবচেয়ে খোলামেলা ব্যক্ত করেছেন। প্রাণীর মাঝে যে ঈশ্বর রয়েছেন, সেবায় যে ঈশ্বরকে পাওয়া হয়, সেই ঈশ্বর ও ঐশ্বরিকতার দুঃখময় উপাখ্যান 'দৃষ্টিপ্রদীপ'।

আধ্যাত্মবাদ মানুষকে নিয়ে অলীক কিছুর দিকে অগ্রসর, সাধারণত এমনটাই আমাদের ধারণা দেওয়া হয়। আমাদের বাউল-ফকিরদের কেউ কেউ সেই অলীকের দিকে অগ্রসর পথটিকে ঘুরিয়ে আবার মানুষে নিয়ে আসতে পেরেছেন। এবং 'দৃষ্টিপ্রদীপ'-এর আধ্যাত্মবাদের গোড়াকথাও মানুষ।

এই উপন্যাস আমাকে এক বিচিত্র অনুভব উপহার দিয়েছে। পরশপাথরের সংস্পর্শে যা আসে তা যেমন সোনা হয়ে যায়, তেমনই ঈশ্বরের সংসর্গে এলেও সব ঈশ্বর হয়ে ওঠে।

আমি সবসময় এমন একজন ঈশ্বরের কল্পনা করে এসেছি যিনি আরাধনা চান না। বরং আরাধনায় বিব্রত লাজনম্র হয়ে ওঠেন। এবং তাঁর সেই লালিমা ভোর আর সাঁঝের লালে ধরা পড়ে। এই ঈশ্বর কখনো পরীক্ষা নেন না। কারণ তিনি সত্যিই অন্তর্যামী। দৃষ্টিপ্রদীপে এমন ঈশ্বরকথা উপহার দিলেন বিভূতিভূষণ। আমি ঋণী হয়ে থাকলাম।

বিভূতিভূষণ ভক্তির সঙ্গে একজন সেবাপরায়ণ ঈশ্বর, শুশ্রূষাপরায়ণা প্রকৃতিদেবীকে দেখেছেন সর্বত্র। যাঁর সঙ্গে সত্যচরণ তাঁর নিজ ভাষায় 'বিশ্বাসঘাতকতা' করে এসেছিলেন।

দেখো কাণ্ড, আমি কিন্তু চাইনি। তবু আমার আলাপের মাঝে অলক্ষ্যে 'আরণ্যক' প্রবেশ করেছে। আরণ্যকে রয়েছে শক্তিশালী অপর এক 'অধি'র জগৎ। যে জগৎ মানুষের জন্যে কোটি বছর অপেক্ষা করেছিল।

আবার বিচ্যুত মানুষের ফিরে আসার জন্যও আরো কোটি বছর অপেক্ষা করে যাবে।

আবার 'দৃষ্টিপ্রদীপ' প্রসঙ্গে আসি।

মুসলমান পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছি নবী মুহম্মদের প্রতি ভক্তি নিয়ে। তাঁকে দেখার উদগ্র বাসনা ছিল। যে আয়াত পড়ে ঘুমালে স্বপ্নে তিনি দেখা দেন, পড়েছি কত, দেখিনি তাঁকে। তবে বইয়ের পাতায় দেখেছি জ্যোতির্ময় যিশুর ছবি। যদিও তা কাল্পনিক। তখন জানতেও পারিনি আমার শ্রদ্ধা, বিস্ময় সেই ছবিকে ঘিরে কখন জমতে শুরু করেছিল। ছবিটা আমার জন্যে অন্য এক স্থানকালের প্রবেশপথ ছিল। ছবি তো মূলত তাই! সে ছবির ভেতর দিয়ে আমি যিশুর সময়ে প্রবেশ করতাম।

মানুষ যা দেখে, কল্পনা তারই কোলাজ-প্রতিফলন। ইসলামে প্রাণীর ছবি নিষিদ্ধ। কিন্তু মানুষের সহজাত প্রবণতা, সে ছবি গড়বেই।এ প্রবণতা ঈশ্বরেরই দান। এই বৈপরীত্যে পড়ে অসহায় বোধ করতাম। মুহম্মদের যে ছবি মনে, কাউকে না জানিয়ে তৈরি করতাম, যে হাসি, যে কথাভঙ্গি, যে রহস্য, তা কোথায় যেন যিশুর সঙ্গেই সমসুর হয়ে যেত। দেহজ্যোতি তো বটেই।

'দৃষ্টিপ্রদীপ', 'দেবযান'-এর মতো তৃতীয় পুরুষে বর্ণিত নয়, বরং উত্তম পুরুষে। দৃষ্টির প্রদীপ জ্বালানো বিভূতিভূষণের মনের জগৎ এখানে এত বেশি ব্যক্ত, উত্তমে না এলে অন্তরের কথাগুলো অন্দর থেকে কে বলত?

উপন্যাসের বক্তা জিতু। কী অপরূপ তার শৈশব। এমন কেবল স্বপ্নে ধরা থাকে। শৈশবে খ্রিষ্টান নানদের মুখে বাইবেলীয় সুসমাচারের সংস্পর্শে আসাটা তার নিত্য ছিল। ফলে বাস্তব আর আধ্যাত্মিক জীবনের যাপনমানের একটা মাপকাঠি দাঁড় করিয়ে ফেলতে পেরেছিল জিতু। মনের অজান্তে যিশুকে পথিকৃৎ মেনেছিল। তবে তার পূর্ণদ্যমী অনুসারী হয়নি। হয়েছে গাঢ় অনুরাগী।

আধ্যাত্ম্যের জগতের চাবি, অনুরাগ।

সব মিলিয়ে দৃষ্টিপ্রদীপে আমি জিতুর মানসজগতের সঙ্গে এমনভাবে বাঁধা পড়লাম, যেভাবে জায়মানলতা বাঁধা পড়ে বৃক্ষের সঙ্গে, ছাড়াতে গেলে ছিঁড়ে যায়।

ভারতবর্ষের উত্তরের পূর্বের সেই শীতল, পাহাড়ি, বৃষ্টিতুষারে ছাওয়া চাবাগান এলাকা জিতুর বেড়ে ওঠার সাথি। তা ছেড়ে বাংলার মনোটোনাস সমতল, শিশুমনের কাছে পর হয়ে থাকা অচেনা পাড়াবন, বাস্তবের রূক্ষ বিকিকিনির জগতে জিতু নেমে এলো। যেন দুঃখময় মর্ত্যে অবতরণ, অবনমন ঘটল তার। যিশুর মতোই। এমন তুল্য করে বিভূতিভূষণ আঁকলেন! জিতু-যিশু ধাতুর গণের দিক থেকেও এরা তুল্য হয়ে থাকল। তবে এতদূর মিল খুঁজে বেড়ানো ছেলেমানুষি।

জিতুর জীবনে বিপুলা দুঃখ এনে উপস্থিত করেছে কারা? যারা অমৃতের পুত্রকন্যা তারা। যারা ভগবানের সন্তান, তারাই। তারা মানুষ। পরিবারের মানুষ। তাদের দেওয়া অনাদরে, দুঃখে যখন বাবা মানসিক ভারসাম্য হারালেন, তাকে ছিঁড়ে নিয়ে পথ ভুলিয়ে বহুদূরের বনে রেখে এলো সেই মানুষেরা, যেন 'সুস্থের' জগতে তিনি আর ফিরে না আসতে পারেন।

বিভূতিভূষণ মানুষের মমতাধর্মের প্রচারক। মমতার ছবিকে তীব্র করে তুলতেই, পেছনপটে তাঁকে মানুষের গাঢ় অন্ধকার আঁকতে হয়েছে।

তীব্র অন্ধকার আলোর জননী। জিতুর ভেতর আলো জন্ম নেবে, তার জন্যে যেন একটা প্রাকৃত প্রস্তুতি চলছিল।

আর এক অত্যদ্ভুত ক্ষমতা ছিল জিতুর। একেকসময় তার তৃতীয় নয়ন খুলে যেত। তখন জিতু যা দেখত তা এ ভুবনের দৃশ্য নয়। অতীত আর ভবিষ্যতের যৌথ ষড়যন্ত্রে কোনো অদেখা ভুবনের অদ্ভুত সব ছবি! হয়তো ওটা একটা আয়না-জগৎ। এ জগতে যা ঘটে, ঘটবে বা ঘটেছিল, সে জগতের চৌম্বক আয়নায় তা ধরা থাকে। কারো কারো ইন্দ্রিয়ে আয়নার সেই বিম্ব ধরা পড়ে। যেমন জিতুর ইন্দ্রিয়ে ধরা পড়ত।

জিতুর কথায় একদিনের ভোরের বর্ণনা, কখনো অরণ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়, অথবা বয়ে যাওয়া নদীর। ভাষার বিত্তে এতখানি বিত্তবান বর্ণনা দুর্লভ। সেইসব ভোরে সূর্যের রক্তিম আলোর সঙ্গে, বনানীঘেঁষা রাতগভীরে, নির্জন আশ্রম ঘেঁষা নদীর তীরে ঐশ্বরিকতার সঙ্গে জিতুর যে সম্বন্ধ আবিষ্কার করে তা ভুলব না।

জিতু গোটা উপন্যাসে কেবলই জলের মতো গড়িয়েছে। কোথাও স্থির ছিল না কারণ নিরন্তর এক সংকটের ঢালু জমিন সে অতিক্রম করছিল। কোথাও আকর পেলে তার আকর নিচ্ছিল। আবার যেই কোথাও আঁচ পাচ্ছিল, উবে যাচ্ছিল। ঝরছিল আবার। অন্য কোথাও।

জলধর্ম। আধ্যাত্মের ধর্ম।

জিতুর মনে ঈশ্বর যেচে ছায়া ফেলতে চেয়েছেন কতবার। কিন্তু তার মন যে অধীর। যেভাবে ধর্মই অধর্মের জন্ম দেয়, সেভাবে আধ্যাত্মের সব গুণ যেচে এসে ধরা দিলেও জিতুর তা ধারণ করতে না পারার কারণ সেই গুণগুলোর ভেতরই প্রোথিত। অনুরাগ, মনকে অধীর করে। জল, ক্ষণিকের শান্ত। জিতু তাই ঈশ্বরকে দেখেছিল, জেনেছিল, স্পর্শও করেছিল। কিন্তু তাঁকে পেয়েছিল মালতী।

আমাকে কৈশোরে কাঁদিয়েছিল হুগোর এসমেরালদা। আর তারুণ্যে কাঁদিয়েছে বিভূতিভূষণের মালতী।

একজন আচারনিষ্ঠ ঈশ্বরপ্রেমীর জন্য গোটা জগৎ উপাসনালয়। 'ঈশ্বরকে যে পেয়েছে তার বাইরের আচারের প্রয়োজন নেই। তার ধর্ম সেবার ধর্ম। এবং যিনি সেবা করেন, তিনি সেবক নন, স্বয়ং ঈশ্বর। কারণ পরশপাথরের ছোঁয়া পাওয়া হয়ে গেছে। মালতী তাই ঐশ্বরিক, এবং ঈশ্বর। ঈশ্বর আনন্দময়। এবং আনন্দের পথ দুঃখময়।

দুঃখ, আধ্যাত্মের অগ্নিপরীক্ষা।

জিতু, মালতী, এই পরীক্ষায় কি তারা উৎরে গেছে? এ বহুদিকগামী আলোচনা। আমার বিচারে ঈশ্বরকে যে স্পর্শ করেছে মাত্র, পায়নি, তাকে এই অগ্নিপরীক্ষায় আমি একবার উৎরে যেতে দেখেছি। আরেকবার নিজ অহমের আঁচে পুড়ে হেরে যেতে দেখেছি। আর ঈশ্বরকে যে পেয়েছে, তাকে আমি হেরে যেতে দেখেছি, আবার প্রতীজ্ঞাপূরণের আলোয় আলোকায়িত তাকে জিতে যেতেও দেখেছি।

সত্যিকার আধ্যাত্ম্যবাদ কোনো সিদ্ধান্ত দেয় না। সে মনের ভেতর কেবলই বৃত্তস্থিত বৃত্ত রচনা করে। এই বৃত্তকে আমরা মণ্ডলে নিয়েছি। সুমেরীয় সুফিরা এই বৃত্তকে নৃত্যে গ্রহণ করেছে।

জিতুর প্রাণে যিশু খুব করে পশেছেন। ভারতবর্ষীয় কোনো অবতার তেমনিভাবে নন। যদিও যিশুর বাণী ভারতবর্ষীয় বাণীরই সমসুর। সেবা পরম ধর্ম, দুঃখ থেকে মুক্ত আমাদের এক সম্রাটপুত্রও বলে গেছেন। যিশুর প্রতি কথায় যেন সিদ্ধার্থের অনুরণন।

তারে স্বীকৃতি দিতেই যেন জিতুর যাত্রার সঙ্গে সম্রাটপুত্র সিদ্ধার্থের যাত্রাও মিলে যায়। বাস্তবযাত্রা, মানসযাত্রা দুটোই।

সিদ্ধার্থ বলেছিলেন, সম্রাট দুই পথে হওয়া যায়। পৃথিবীর ভূমি দখল করে। মনের ভূমি জয় করে। পৃথিবীর ভূমি সীমায়িত। মনের ভূমির কোনো সীমা নেই। সিদ্ধার্থ উত্তরাধিকারে পৃথবীর ভূমি-সাম্রাজ্য পেয়েছিলেন। কিন্তু তা ছেড়ে তিনিই মনোভূমি সম্রাট হওয়াকেই বেছে নিলেন। যতটা তিনি আমার সম্রাট, ততটা কি যশোধরারও।

আধ্যাত্ম্য এমনি করে, কোনো কোনো জীবনদৃশ্যে রক্তপাতকে অনিবার্য করে তোলে। রসের ক্ষরণ বন্ধ হয়। কারণ তার বিপরীতে ক্রিয়াশীল আছে ক্ষয়পূরণ। কিন্তু হৃদয়ের ক্ষরণ কখনো বন্ধ হয় না। কারণ তার অনুকূলে মৃত্যুর সঙ্গে যোগ। আর মৃত্যু অনিবার্য। হৃদয়ের ক্ষরণ তাই স্মৃতির পলির নিচে চাপা পড়লেও, ভূগর্ভস্থ ধারার মতো বহতা থাকে। মৃত্যুকে ডাকে।

মৃত্যু, আধ্যাত্ম্যের জীবন।

আর আমার প্রথম কৈশোরে এই মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয়টাও করিয়ে দিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। মায়ের সঙ্গে সরলবিশ্বাসে বইমেলা থেকে 'আম আঁটির ভেঁপু' কিনে ফিরেছিলাম (অলক্ষ্যে পথের পাঁচালীও প্রবেশ করল)। দুর্গা যে আর পৃথিবীর আলোয় চোখ চাহিবে না, তা আমি আমার প্রথম কৈশোরের ঘোরতর দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অবিশ্বাস নিয়ে সেই বাক্যটা বারবার পড়ে গেছি! তখনো আমার অভিধানে 'মৃত্যু' শব্দটি ছিল না। অতঃপর পরিচয় ঘটল। সেই শুরু। •

হামিম কামাল
কথাসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

বিনয় মজুমদার (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৪ – ১১ ডিসেম্বর, ২০০৬)

প্রবন্ধ

বিনয়ের ফিরে এসো, চাকা

জীবনানন্দ পরবর্তী প্রাতিস্বিক সংযোজন

পারভেজ আহসান

কবি জীবনানন্দ দাশের পরবর্তী সময়ে যে ক'জন কবি কবিতানিমগ্ন পাঠককে আলোড়িত করে কল্পতরুর শাখা-প্রশাখায় সুবাসিত ফুলের প্রস্ফুটন ঘটিয়ে ভাবালুতায় নিমজ্জিত করে কাব্যরসে সিক্ত করেছে তাঁদের মধ্যে কবি বিনয় মজুমদারের অবস্থান শীর্ষস্থানে। নিঃসন্দেহে তিনি একজন প্রভাবসঞ্চারী কবি। আর সে কারণেই বর্তমান সময়ের একজন তরুণ কবি তাঁর কাব্যভুবনে প্রবেশ করে ভাষা হারায়। তাঁর অপূর্ব শব্দচয়ন, গভীর চিন্তনশক্তি, অভিনব প্রতীক-উপমা, কবিতার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে গাণিতিক ভাবনার ব্যবহার প্রত্যক্ষণ করে এ কবির আলোকময় প্রতিভাকে কিছুটা আঁচ করতে পারে। তাঁর কাব্যযাত্রায় ছিল প্রাতিস্বিকতার ছোঁয়া। এক জ্যোতির্ময় নক্ষত্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলা কাব্যভুবনে। বুদ্ধদেব বসু যেভাবে অনুমান করতে পেরেছিলেন কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতিভা, অনুরূপভাবে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় দেখেছিলেন বিনয়ের ঠিকরে পড়া প্রতিভার আলোকশিখা

আর তাই, তিনি 'কবিতাবিষয়ক' প্রস্তাব শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, 'অন্যান্য বস্তু বর্ণনা করার সময়–সেসব বস্তুর মধ্যে অগণ্য সত্য ও বৈজ্ঞানিক বিচার লিপিবদ্ধ করা, মনে হয়, বিনয়ের কবিতার একরূপে বিশিষ্ট নিয়ম। আমি এমন ধরনের বৈজ্ঞানিক সত্যকে সরাসরি কবিতার মধ্যে হৃদয়গ্রাহী এবং পরাস্ত ভঙিতে বসিয়ে দেওয়া বাংলা কেন নানা সময়ে প্রকৃত ইংরেজি বা বিদেশি কবিতাতেও পড়ি নাই।' 'প্রকৃত প্রস্তাবে' খুব কম জনই বিনয়ের মতো কবিতার ভিতরে প্রবেশ করতে পেরেছিল। কবিতা ও গণিত সত্যকে দীপ্তিময় করে। সত্যের নির্দেশক হিসেবে কাজ করে। আর তাই গণিতের চিন্তা তার সমস্ত চিন্তার ভিতরে একটি প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। ঋত্বিক ঘটক বিনয় মজুমদার সম্পর্কে বলেন, 'আমি সাম্প্রতিক কালের এক কবির সম্পর্কে আশা রাখি, যিনি কবিতার জন্য যথার্থ জন্মেছেন। আমার মনে হয় একালে বাংলাদেশে এত বড় শক্তিশালী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন কবি আর জন্মাননি।'

তাঁর 'ফিরে এসো, চাকা', 'অঘ্রাণের অনুভূতিমালা', 'বাল্মীকির কবিতা', 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ', 'পৃথিবীর মানচিত্র' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থগুলো কবিতাপ্রেমীদের অনুভূতিকে নাড়িয়ে দেয়, আত্ম-উপলব্ধিকে জাগ্রত করে, বিজ্ঞানমনস্ক হতে শেখায়, এবং নান্দনিকতার আবেশ ছড়ায়। উল্লেখিত কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে 'ফিরে এসো, চাকা'র ষাট বছর পূর্ণ হলো। অর্থাৎ ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয়েছিল এ গ্রন্থটি। ষাট বছর কিন্তু কম সময় নয়। কবিতার মধ্যে চিরায়ত আবেদন, দর্শন, বিষয়-প্রকরণে বৈচিত্র্য না থাকলে, নতুনত্ব ও অভিনবত্বের সংশ্লেষ না থাকলে এবং অধিকন্তু আগুন ও শক্তি না থাকলে কবিতা কখনো কালকে অতিক্রম করে শাশ্বত হয়ে ওঠে না। এ কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো ষাট পেরুলেও এখনো দুর্দান্ত তাজা। তাই, এ গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলো এখন শাশ্বতের পথে। 'ফিরে এসো, চাকা' সম্পর্কে অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথাগুলো প্রাসঙ্গিক: 'মাত্র একখানি কাব্যগ্রন্থের জন্য বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন মণ্ডপের নিচে যদি কেউ স্থায়ী আসন পেয়ে থাকেন; তিনি বিনয় মজুমদার। অথচ গুরুত্বপূর্ণ এবং উল্লেখনীয় কাব্যগ্রন্থ তার আরও বেশ কয়েকটি রয়েছে। 'অঘ্রানের অনুভূতিমালা', 'বাল্মীকির কবিতা', 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' এবং আরও কয়েকটি। কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা' এককথায় অনন্য। একমেবাদ্বিতীয়ম। কাব্যরসের গুণে, শৈল্পিক দক্ষতায়, চিরকালীন আবেদনে এই বইটি সমস্ত দশকের নির্দিষ্ট সীমারেখা ছাড়িয়ে তাবৎ কবিতাপ্রেমীর কাছে 'মিথ' হয়ে আছে। এ যেন এক জাদুকরের ছোঁয়া। অজস্র জাদুপঙ্‌ক্তির কুহক মুগ্ধ, বিস্মিত করে রাখে। বারবার পড়ার পড়েও ফুরতে চায় না পাঠের আনন্দ। রোমাঞ্চ। মাত্র একটি কাব্যগ্রন্থের এই যে অমরত্ব লাভ, এই বিপুল জনপ্রিয়তা এমন নজীর দেখতে পাওয়া যায় না খুব বেশি।'

'ফিরে এসো, চাকা' কাব্যগ্রন্থে 'চাকা' শব্দটি কিসের ইঙ্গিত বহন করছে তার রহস্যের ঘেরাটোপে আবর্তিত অসংখ্য কাব্যানুরাগী। চাকা কী গতি অথবা চলমানতার নির্দেশক, নাকি গায়ত্রী চক্রবর্তী। এ বিষয়টির উত্তর এখনো রহস্যাবৃত। শামীমুল হক শামীম ও অমলেন্দু বিশ্বাসের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বিনয় মজুমদার বলেন, 'অনেকে বলেন মহিলাকে নিয়ে লেখা এটাও মিথ্যা নয়, বাজে কথা নয়। প্রথমে গায়ত্রীকে নিয়েই লেখা পুরো বই–৭৭টি কবিতা। আবার আমাকে নিয়ে লেখা। পাঠকের জীবন নিয়ে লেখা।' তাঁর এ কথাতে কোনো সুনির্দিষ্ট উত্তর নেই। সে যাই হোক। বিনয় যে একজন বিজ্ঞানমনস্ক কবি তাঁর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হলো 'চাকা' শব্দটির ব্যবহার। চাকাকে আহ্বানের মাধ্যমে জীবনে স্তবিরতা কাটিয়ে চলিষ্ণু জীবনকে বোঝাতে চাচ্ছেন অথবা গায়ত্রীকে তার জীবনচলার শক্তি হিসেবে কল্পনা করেছেন।

এ গ্রন্থের প্রথম কবিতাটি পাঠককে চিন্তায় নিমগ্ন করে –আবিষ্ট করে। শব্দাবলির গূঢ়ার্থ হৃদয়ের মর্মমূলে স্পর্শ করে। কে এই উজ্জ্বল মাছ? কবি নিজে না অন্য কেউ? এক ধরনের রহস্যের বাতাবরণ সৃষ্টি করে কবিতাটি–

'একটি উজ্জ্বল মাছ একবার উড়ে
দৃশ্যত সুনীল কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বচ্ছ জলে
পুনরায় ডুবে গেলো–এই স্মিত দৃশ্য দেখে নিয়ে
বেদনার গাঢ় রসে আপক্ব রক্তিম হলো ফল
বিপন্ন মরাল ওড়ে, অবিরাম পলায়ন করে,
যেহেতু সকলে জানে তার শাদা পালকের নিচে
রয়েছে উদগ্র উষ্ণ মাংস আর মেদ।'

উপরিউক্ত পঙ্‌ক্তিগুচ্ছে 'একটি উজ্জ্বল মাছ' শব্দবন্ধের মাধ্যমে মনোলোভা সুন্দর অথবা সু-সময়কে ইঙ্গিত করার হলো। সুন্দর মুহূর্ত স্থায়ীরূপে না থেকে গাঢ় বেদনার সৃষ্টি করে। এ কবিতায় ফুটে উঠেছে কবির অসাধারণ কাব্যদর্শন। কবি বিশ্বাস করেন দূরত্ব দীর্ঘ হলেও মিলনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে প্রাণের গভীরে–'তবু সব বৃক্ষ আর পুষ্পকুঞ্জ যে -যার ভূমিতে দূরে-দূরে/ চিরকাল থেকে ভাবে মিলনের শ্বাসরোধী কথা'। অভূতপূর্ব সংকেত ও চিহ্নায়নের মাধ্যমে ভালোবাসার অন্তর্লীন বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন কবি। একই সাথে যৌনাকাঙ্ক্ষা বহমান সমান্তরালে।

ভালোবাসা পোড়ায়, যন্ত্রণা ছড়ায়। ফলে কণ্ঠ নীল হয়। মোহভ্রম ঘটলে দীর্ঘশ্বাসের আগুনে ছাই হয় অন্তর। তীব্র দহন চলে অবিরাম। 'তাপহীন আলোহীন গ্রহ না দেখে, প্রকৃত সুন্দর খুঁজে না পেয়ে অনুভব করে তীব্র কীটযন্ত্রণা। বিনয় মজুমদারের এই উপলব্ধির প্রকাশ নিম্নরূপ :

'জেনেছি নিকটবর্তী এবং উজ্জ্বল তারাগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে
সব গ্রহ, তারা নয়, তাপহীন আলোহীন গ্রহ।
আমিও হতাশাবোধে, অবক্ষয়ে ক্ষোভে ক্লান্ত হয়ে
মাটিতে শুয়েছি একা–কীটদষ্ট নষ্ট খোশা, শ্বাঁস।'

বিনয়ের কবিতার শব্দ ও রূপকের ব্যবহার এমন একটি বোধের সৃষ্টি করে যা কবিতার আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে এক ভিন্ন অনুভূতির সঞ্চারণ ঘটায়। ভালোবাসাই হচ্ছে গ্রন্থভুক্ত কবিতার মূল মন্ত্র; তাঁর কবিতার মূল সুর। ভালোবাসা গায়ত্রীমন্ত্র। কবি তাঁর মানস প্রেমিকাকে ফিরে পাওয়ার জন্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন বারবার। তাঁর প্রেমিকাকে ফিরে পাওয়ার বাসনায় স্মৃতির মন্থনে নিমগ্ন তিনি। তাঁর নিরস ও বিশুষ্ক জীবনে প্রাণের সঞ্চারের জন্যেই গায়ত্রীর প্রতি তাঁর এ আহ্বান। কিন্তু কবির ভালোবাসায় কোনো রহস্যময়তা নেই। ভালোবাসা গাণিতিক বিশ্লেষণের মতো স্পষ্ট ও সত্য :

বেশ কিছুকাল হল চ'লে গেছো, প্লাবনের মতো
একবার এসো ফের; চতুর্দিকে সরস পাতার
মাঝে থাকা শিরীষের বিশুষ্ক ফলের মতো আমি
জীবন যাপন করি; কদাচিৎ কখনো পুরোনো
দেয়ালে তাকালে বহু বিশৃঙ্খল রেখা থেকে কোন
মানুষীর আকৃতির মতো তুমি দেখা দিয়ে ছিলে।
পালিত পায়রাদের হাঁটা, ওড়া, কূজনের মতো
তোমাকে বেসেছি ভালো তুমি পুনরায় ফিরে গেছো।

জীবনানন্দ দাশের 'আকাশলীনা'র সাথে এ কবিতার কি কোন সাযুজ্য আছে? না। মোটেও নয়। আকাশলীনায় আছে রোম্যান্টিকতার প্রস্রবণ। কিন্তু এ কবিতায় আছে বাস্তবতা সৃষ্ট উপলব্ধি, ব্যক্তি জীবনে কাছে পাওয়ার তীব্র আকুতি। তাঁর প্রেমিকাকে একবারের জন্যে প্লাবনের মতো ফিরে আসার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তিনি। এ আকুতি কি আত্মিক না শারীরিক? প্রশ্নটি জেগে ওঠে পাঠকঅন্তরে।

'ফিরে এসো, চাকা'র দ্বিতীয় কবিতাটি একটি প্রতীকাশ্রিত কবিতা। এ কবিতায় দেবদারু একটি রহস্যময় বৃক্ষ হিসেবে মূর্তমান। মৃত্তিকা থেকে বেড়ে ওঠা দেবদারু গাছের ভিতরে তিনি দেখেছেন জীবনের প্রতিচ্ছায়া। মানুষ বিপদসঙ্কুলতার মধ্যদিয়ে হেঁটে রহস্যের উন্মোচন করতে চায়।

'এ-সত্য জেনেও তবু আমরা তো সাগরে আকাশে
সঞ্চারিত হতে চাই, চিরকাল হতে অভিলাষী,
সকল প্রকার জ্বরে মাথা ধোয়া আমাদের ভালো লা'গে বলে
তবু কেন যে আজো, হায় হাসি, হায় দেবদারু
মানুষর নিকট গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়।'

বিনয় মজুমদার মোহের মায়াজাল কাটিয়ে নক্ষত্রের পথ চিনতে চিনতে

নিজস্ব বোধের মুখোমুখি হয়ে বুঝে নিয়েছিলেন 'মানুষ নিকটে গেলে প্রকৃত সারস উড়ে যায়'। মানুষের মোহভ্রম ঘটে।

এ কবির কবিতা পাঠ করলে স্নায়ুতে এক ধরনের ভালোবাসাচর অনুরণন সৃষ্টি হয়। বিমূর্ত এই ভাবনা অসীমতার দিকে ঠেলে দেয়। বিচ্ছেদের সানাই বাজে হৃদয়ের গভীরে। গ্রন্থভুক্ত চতুর্থ কবিতাটি কবির মনে হয়েছিল তিনি মেঘের জলবিন্দুর মতো মুক্ত স্বাধীন ছিলেন একসময়। এখন তিনি মৃত্তিকায় পতিত স্থির জলবিন্দু। কোথাও আনন্দ-উল্লাসের অস্তিত্ব নেই। তাঁর মনে হয় তার মানসপ্রিয়া কেবলি বেদনার দানা নিয়ে একাকী খেলা করে। বিনয়ের আত্মপোলব্ধির বিষয়টি শৈল্পিক ঢঙে উঠে এসেছে এ কবিতায়:

'আকাশআশ্রয়ী জল বিস্তৃত মুক্তির স্বাদ পায়, পেয়েছিল
এখন তা মৃত্তিকায়, ঘাসের জীবনে, আহা, কেমন নীরব।
মহৎ উল্লাস, উগ্র উত্তেজনা এই ভাবে শেষ হতে পারে?
ইপ্সিত গৃহের দ্বারে পৌঁছানোর আগেই যে ডিম ভেঙে যায়–
এই সিক্ত বেদনায় দূরে চলে গেলে তুমি, পলাতকা হাত
বেদনার দানা নিয়ে একা-একা খেলা করো, সুকুমার খেলা।
ঘণ অরণ্যের মধ্যে সূর্যের আলোর তীব্র অনটন বুঝে
তরুণ সেগুন গাছ ঋজু আর শাখাহীন, অতী দীর্ঘ হয়;'

এ পঙ্‌ক্তিগুচ্ছের শেষ দুটো পঙ্‌ক্তিতে প্রত্যাশা ও প্রপ্তির দ্বান্দ্বিক রূপের প্রকাশ পেয়েছে। বিনয়ের বিশ্বাস, 'সৃষ্টির মূল যে সূত্রগুলি তা জড়ের মধ্যে প্রকাশিত, উদ্ভিদের মধ্যে প্রকাশিত, মানুষের মধ্যেও প্রকাশিত। এদের ভিতরের সূত্রগুলি পৃথক নয়, একই সূত্রে তিনের ভিতরে বিদ্যমান।' তাঁর এই দর্শনই প্রতিভাত হলো উদ্বৃত কবিতায়।

উৎপ্রেক্ষা, প্রতীকের ব্যবহার ছাড়াও দর্শনের উপস্থিতি পরিলিক্ষিত হয় বিনয় মজুমদার কবিতায়। এ সম্পর্কে তাঁর 'আত্মপরিচয়' প্রবন্ধে বলেন, '... ... এই দর্শনের উপস্থিতি কবিতায় একেবারে প্রত্যক্ষ–না হলেও চলে, হয়তো তার অভ্যাস মাত্র থাকলেই হয়। কিন্তু অভ্যাসই হোক আর যাই হোক উপস্থিতি অবশ্যই প্রয়োজন। এই উপস্থিতিতেই পাঠকের মনকে ভাবাবেগে আন্দোলিত করে, রসাপ্লুত করে, কবিতাকে চিরস্থায়ী করে।' 'ফিরে এসো, চাকা'র ষষ্ঠ কবিতায় পরিলক্ষিত হয় দর্শনের উপস্থিতি। তিনি মনে করেন অপ্রাপ্তি, ব্যর্থতা মানুষের আত্ম-চিন্তাকে শানিত করে। মানুষের অভ্যাস চিরায়ত স্বভাবের দিকে না গিয়ে অন্যদিকে যাওয়া, প্রকৃত সত্যের দিকে ধাবিত না হয়ে অন্য কিছুকে খোঁজা।

'প্রতিটি ব্যর্থতা, ক্লান্তি -কী অস্পষ্ট আত্মচিন্তা সঙ্গে নিয়ে আসে।
সতত বিশ্বাস হয়, প্রায় সব আয়োজনই হয়ে গেছে, তবু
কেবল নির্ভুলভাবে সম্পর্ক স্থাপন করা যায় না এখনো।
সকল ফুলের কাছে এতো মোহময় মনে যাবার পরেও
মানুষেরা কিন্তু মাংস রন্ধনকালীন ঘ্রাণ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।'

এ গ্রন্থের পঁয়ষট্টিতম কবিতায় জীবন থেকে অর্জিত এক অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে। ভালোবাসা ধারণের সামর্থ্য ও যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। মানুষের কাছ থেকে ভালোবাসা ক্ষয়ে যায় নিরন্তর। তবুও কবি উজার করে বিলিয়ে দিতে চান ভালোবাসা। এ কবিতায়ও তাঁর দুঃখবোধ ফুটে উঠেছে প্রথম পঙ্‌ক্তিতে।

ভালোবাসা দিতে পারি, তোমরা কি গ্রহণে সক্ষম?
লীলাময়ী করপুটে তোমাদের সবই ঝ'রে যায়–
হাসি, জ্যোৎস্না, ব্যথা, স্মৃতি অবশিষ্ট কিছুই থাকে না
এ আমার অভিজ্ঞতা। পারাবতগুলি জ্যোৎস্নায়
কখনো ওড়ে না; তবু ভালোবাসা দিতে পারি আমি।

'ফিরে এসো, চাকা' শীর্ষক কাব্যগ্রন্থে বিনয় মজুমদার প্রতিটি শব্দ ভিতর থেকে নিঃসৃত আগুন দিয়ে পোড়ে শুদ্ধতার জলে ভিজিয়ে ব্যবহার করেছেন। কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলোর প্রতীকি ব্যঞ্জনা পাঠককে মুগ্ধতায় আচ্ছন্ন করে। তাঁর কবিতার গদ্যময় ধ্বনিব্যঞ্জনা, সহজ কথকতা, বিজ্ঞানমনস্কতা, জীবন দর্শন তার কবিতাকে অমরত্ব অর্জনে সহায়তা রকরবে। অনেকে মন্তব্য করেন বিনয় মজুমদার জীবনানন্দ দাশ থেকে জন্মেছে। এ কথাটি সম্পূর্ণ ঠিক নয়। তাঁর কাব্যযাত্রার শুরুতে জীবনানন্দ দাশের প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল কিন্তু 'ফিরে এসো, চাকা' থেকেই শুরু হয় তার স্বতন্ত্র কাব্যযাত্রা। •

পারভেজ আহসান
কবি ও প্রাবন্ধিক

ঘটনাপঞ্জি ❖ সেপ্টেম্বর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

০১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬	❖	শ্রীল স্বামী প্রভুপাদের জন্ম
০১ সেপ্টেম্বর ১৯১৪	❖	মৈত্রেয়ী দেবীর জন্ম
০৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৬	❖	উত্তমকুমারের জন্ম
০৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪	❖	প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম
০৭ সেপ্টেম্বর ১৯৩৪	❖	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম
১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪	❖	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম
১৪ সেপ্টেম্বর ১৯০৪	❖	সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্ম
১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬	❖	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম
১৭ সেপ্টেম্বর ১৯১৫	❖	মকবুল ফিদা হুসেনের জন্ম
২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০	❖	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্ম
২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩	❖	রাজা রামমোহন রায়ের মৃত্যু

কমলা দাস সুরাইয়া (৩১ মার্চ, ১৯৩৪ – ৩১ মে, ২০০৯)

অনূদিত কবিতা

কমলা দাস সুরাইয়ার কবিতা

অনুবাদ : সন্তু জানা

১৯৩৪ সালে ভারতের কেরল রাজ্যে জন্ম। ভারতীয় ইংরেজি কাব্যধারার এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি কমলা দাস। অন্ধ সমাজের খোলস ছেড়ে বেরিয়ে এসে এক অদ্ভুত 'confessional' ঘরানায় জীবনের মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। আজীবন কৃষ্ণভক্ত এই নারীবাদী কবি মুখ্যত কলম ধরেছেন ভারতীয় নারীর জীবনে প্রেম, অজ্ঞানতা, ব্যর্থতা, বিশ্বাসঘাতকতা আর এই সব মিলিয়ে নারীজীবনের অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা শোনাতে

তাঁর সোচ্চার কণ্ঠ প্রাক-স্বাধীনতাকালীন দেশের গতানুগতিক কাব্যভাষা এবং অনুভূতির দম বন্ধ করা মারপ্যাঁচ থেকে মুক্ত এক ছিলিম টাটকা বাতাসের ন্যায়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের ঠুনকো প্রেমের গালে সপাটে চাঁটি মেরেছেন এই বোহেমিয়ান কবি। ভারতীয় উপমহাদেশে প্রতিনিয়ত পুরুষের নখর থাবায় শিকার হয়ে যাওয়া নারীর অন্তর্লীন দুর্দশার সুর শোনা যায় তাঁর কবিতায়। 'The Looking Glass' কবিতায় তিনি বলছেন : 'Gift him all what makes you woman, the scent of long hair, the musk of sweat between breasts / the warm shock of menstrual blood, and all your / endless female hungers...'। দৃপ্ত নারীকণ্ঠের এই কাঠিন্য ভারতের কমলা দাস সুরাইয়াকে আমেরিকার Sylvia Plath-এর মতো প্রখ্যাত 'Confessional Poet'-দের সঙ্গে একই সারিতে বসার অবলম্বন যুগিয়েছে। জন্মসূত্রে মালয়ালি ব্রাহ্মণকন্যা কমলা পরবর্তীকালে বিবাহসূত্রে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে 'সুরাইয়া' নাম গ্রহণ করেন।

ঠাম্মির বাড়ি

বাড়িটি থেকে আজ বহু দূরে আমি, একদিন
অপরিমেয় আদর-যত্ন দিয়েছে সে আমায়... সেই আদুরে ঠাম্মিও তো আর নেই,
বাড়িটি যেন বাকহীন, নিথর বদন। অতীতের অমূল্য সব বইয়ের ঢিবিগুলোতে আজ কালসর্পের আস্তানা,
শৈশবের এক অপরিপক্ব পাঠকের রক্তপ্রবাহে দৃশ্যটি আজ বয়ে নিয়ে এল চাঁদের মতো শিহরন।

কতবার ভেবেছি আরও একবার ফিরে যাব। ঘুলঘুলির ফাঁক দিয়ে
উঁকি মেরে দেখব অতীতকাল অথবা প্রাচীন বাতাসের গুমোট শব্দ শুনব
অথবা চরম হতাশায় কুড়িয়ে নিয়ে আসব একমুঠো
ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমার শোবার ঘরের প্রবেশপথে
ঘুমে ঢুলতে থাকা একটা নেড়িকুত্তার মতো সাজিয়ে রাখব তাকে। ...

তুমি নিশ্চয়ই এসব বিশ্বাস করবে না, প্রিয়তম, আদৌ করবে কি,
যে এরকমই এক সমৃদ্ধ বাসাবাড়িতে একদিন সগর্বে, সকলের নয়নের মণি হয়ে
দিন কাটিয়েছে যে চঞ্চলা কিশোরী.... সেই আমি, আজ
পথভ্রষ্ট পথিক এক, নামগোত্রহীন দরজাগুচ্ছের সামনে ভিক্ষার ঝুলি
পেতে দাঁড়িয়ে আছি একটুখানি ভালোবাসা সংগ্রহ করব বলে, সামান্য
খুদকুঁড়োর মতো হলেও?

মূল কবিতা : My Grandmother's House
কাব্যগ্রন্থ : Summer in Calcutta (1965)

পিরীত

যতদিন পাইনি তোকে,
ছন্দে-কবিতায় সাজিয়েছিলাম বক্ষপট, তুলির ছোঁয়ায় বেঁধেছিলাম স্বপ্নঘর,
পায়ে পা মিলিয়ে গুটিগুটি এগিয়েছিল পথ,
এলোমেলো অগোছালো বন্ধুরা সব...

আজকে সাধের পিরীত করেছি বলে,
একটা আধ-বুড়ো খচ্চরের মতো দলা পাকিয়ে গুটিয়ে যাওয়া
বিক্ষত নারীজীবন আমার, ভীষণ তৃপ্ত
শুধু তোর ভেতরে...।।

মূল কবিতা : Love
কাব্যগ্রন্থ : Summer in Calcutta (1965)

শুককীট

নিভু নিভু আলো, মলিন নদীর দেশে
শেষবারের মতো আলতো ভালোবেসে
প্রেয়সীকে একলা ছাড়ি
চলি গেলা বাসুদেব...

সেই রাতে কৃষ্ণঘোরে, স্বামীদেবতার বাহুডোরে
নিঝুম রাধিকা একা
মৃত্যুর স্বাদ পেলে, জিজ্ঞাসে পতিবর,
তোমার অনুভবে আজ
এই বর্ণহীন সাজ, কী কারণে শুনি বলো,
তবে কী প্রিয়,
আমার আবেগ আমার দিঘল চুম্বন
করিতেছে আজ ব্যর্থতারে অবলম্বন!

উত্তরিলা রাধিকা, হে প্রভু,
তাহা তো বলিনি কভু
শুধু ভাবি অন্তরে,
গোপন প্রেম গুমরে মরে,
শুষ্ক খোলসদেহ ফেলে রেখে যখন প্রিয়
কীটাস্ত ভ্রূণখানি খামচিয়ে বার করে।।

মূল কবিতা : The Maggots
কাব্যগ্রন্থ : The Descendants (1967)

গুমোট কলকাতা

এটা কি আদৌ কোনো পানীয়, নাকি
মধ্য এপ্রিলের গনগনে সূর্যের আঁচ, একটা
কমলালেবুর মতো আমার গেলাসে
নিংড়ে দেওয়া হয়েছে? আমি চুমুক দিই
আস্ত আগুনের গোলা, আমি বারবার
পান করি সেই সুরা, যেন পাঁড় মাতাল একটা।

তথাপি, সূর্যের সোনালি তরঙ্গে
মিশে মিশে থাকা কোন্ সে অনুক্ত কুলীন বিষ,
যা আমার শিরা-উপশিরায় নিরন্তর ছুটে চলেছে
ভরিয়ে তুলেছে মন প্রাণ এক অব্যক্ত হরষে?

আমার সকল হয়রানিতে আজ ঘুম-ঘুম ঝিমুনি। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র
বুদবুদের ঘেরাটোপে আমার রঙিন গেলাস,
ঠিক যেন লাজে-রাঙা কনেবউটির মিঠে হাসির মতো
ছুঁয়ে দিলো আমার ওষ্ঠদ্বয়, আমার নিশ্বাস। হে প্রিয়, ক্ষমা করো
এই ঝাপসা স্মৃতিটুকু, তোমাকে নিজের করে পাওয়ার এই ক্ষুদ্র আকুতিটুকু।

হায়, কত সংক্ষিপ্ত অনুরাগ আমার
আর কতই না ক্ষুদ্র তোমার নির্মেদ রাজত্ব, যখন আমি
গেলাস হাতে চুমুক দিতে দিতে পান করে চলেছি
শহরের উষ্ণতম দিনের বিষাক্ত সূর্যরস।

মূল কবিতা : Summer in Calcutta
কাব্যগ্রন্থ : Summer in Calcutta (1965)

অলংকরণ : মিজান স্বপন

বহ্নিলতা

অমর মিত্র

ধারাবাহিক উপন্যাস

সুশান্ত বলেছিল, স্যারকে বললাম আপনি সরে যান, স্যার কাঁদছিলেন। অতনু বলেছিল, ল্যাবরেটরিটা স্যার নিজে গুছিয়ে নিয়েছিলেন, স্যার তো কেমিস্ট্রি ছাড়া আর কিছু জানেন না, রাত আটটা অবধি ল্যাবরেটরিতে পড়ে থাকেন। সুশান্ত বলেছিল, সেদিন অত রাতে গিয়ে দেখি স্যার বসে আছেন, তিনি যেন আমাদের জন্যই বসে ছিলেন, আমরা স্যারকে বেরিয়ে যেতে বলি, গুরুদাস কলেজের নবনীত স্যারের পিঠে পিস্তল ঠেকিয়েছিল, আমাদের কিছু করার ছিল না, তুই বিপ্লবের গান পড়েছিস অতনু?

না, পড়িনি, পড়ব। অতনু বলেছিল।

নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ইস্পাত পড়েছিস? জিজ্ঞেস করেছিল সুশান্ত।

না, পড়িনি পড়ব। অতনু স্তিমিত গলায় জবাব দিয়েছিল।

তাহলে তুই কী পড়েছিস, এসব না পড়লে লিখবি কীভাবে?

চেখব পড়েছি, গোরকির আমার ছেলেবেলা, চেলকাশ আর পথের পাঁচালী, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা, পদ্মা নদীর মাঝি, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশ সেনের গল্প। সুশান্ত বলেছিল, বিপ্লবের গান আর ইস্পাত পড়, দেখবি তোর লেখাই বদলে যাবে, তুই আর ঘরে থাকবি না, কৃষকের ঘরে গিয়ে তাদের দুঃখের কথা শুনে তাদের কথা লিখতে পারবি

অতনু বলেছিল, আমাকে চাকরি করতে হবে, বাবা তিন বছর বাদে রিটায়ার করবেন, আমার লেখা হবে না সুশান্ত, আমি ভয় পাই, আমার ঘাড়ে অনেক দায়িত্ব।

সুশান্ত চুপ করে শুনেছিল অতনুর কথা। হ্যাঁ, 'সংক্রান্তি' পত্রিকা বন্ধ হয়ে যাবে। উপায় ছিল না। অতনু চালাবে কী করে? খরচ আছে তো। সে নব্বই টাকার টিউশনি করত। সেই টাকা থেকে কলেজের মাইনে দিত। বাবার কাঁধে ভার ছিল অনেক। নব্বই টাকাই তার সব।

সুশান্ত বলল, মুক্তি নিয়ে সে ফিরে আসবে, অতনুর হাত ধরে বলেছিল, এই শহর নিয়ে কতটা কী লিখবি তুই অতনু, বস্তাপচা প্রেমের নভেল, সারাদেশে কৃষকের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়েছে, লেখা হবে তাই নিয়ে, তুই চল আমার সঙ্গে, আর একটা বিপ্লবের গান লিখতে হবে তোকে কমরেড, কমরেড লেনিনের ডাকে জাগে মুক্তি সেনানি।

অতনু চুপ করে ছিল। তার হাত নিজের শক্ত হাতে চেপে ধরেছিল সুশান্ত। অতনুর ভয় করছিল। বইয়ে বিপ্লবের গান পড়া, নিকোলাই অস্ত্রোভস্কির ইস্পাত পড়া আর ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রয়োগ এক রকম নয়। বই পড়ার মতো সহজ নয়। যতই তারাশঙ্কর সামন্ততন্ত্রের অবসানের কথা লিখুন, তার জন্য বিপ্লবীদের কাছে নিন্দিত হন, তাঁর মতো চেনে না কেউ নিম্নবর্গের মানুষ। পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় এসে যে ভাড়াটে ফ্ল্যাটে উঠেছিল তার বাবা, সেই অপরিসর অন্ধকার ফ্ল্যাট ছেড়ে এক পাও এগোতে পারেননি তিনি। বেঁচে থাকা, সন্তানদের বাঁচিয়ে রাখা কত কষ্টের। অতনুর ভালোবাসা আছে বিপ্লবীদের প্রতি, কিন্তু সুশান্তর সহযাত্রী হতে পারবে না সে। সুশান্তর সব কথা সে সমর্থন করতে পারে না। অতনু বের হয়নি ঘর ছেড়ে। অতনু সুশান্তকে আবার বলেছিল, তার সাহস নেই, সে পারবে না। হ্যাঁ, সে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। স্বার্থপর। যদি সুশান্ত বলে সে প্রতিবিপ্লবী, তবে তাইই। সে পারবে না। বাবা মা তার মুখের দিকে চেয়ে আছেন।

সাহস ছিল না অতনুর। কলকাতায় রয়ে গেল। পত্রিকা বন্ধ হলো। সে লিখতে চেষ্টা করেছিল এখানে ওখানে। কিন্তু তেমন সাড়া পায়নি। লেখার জন্যও ত্যাগ করতে হয়। সেই প্যাশন তার ছিল না। চাকরিতে জুটে গেল। জেলায় পোস্টিং। কলকাতা ছেড়ে এই প্রথম বের হওয়া। সুশান্তর সঙ্গে আর দেখা হয়নি। কলেজের বন্ধুরা কলেজ জীবন শেষ হওয়ার পর ধীরে ধীরে সরে যায়। জীবন তাদের নিয়ে যায় নানা ক্ষেত্রে। কেউ খুব বড় হয়, কেউ কিছুই করতে পারে না শেষ অবধি। অতনুদের ইস্কুলের বন্ধু এই বেলগাছিয়া বাজারে সব্জি বেচে। এক বন্ধু ট্রামের কন্ডাক্টর ছিল। আগে বেলগাছিয়া ধর্মতলা রুটে তাকে দেখা যেত। এখন নিশ্চয় রিটায়ার করে গেছে কিংবা অন্য রুটে আছে। এক বন্ধু আই এ এস। এক বন্ধু কাটা কাপড়ের বিজনেস করে। একজনের চায়ের দোকান। তার দোকানের পাশ কাটিয়ে আসার উপায় নেই। হাত ধরে টেনে কুশল জিজ্ঞাসা করবেই। চা-ও খাওয়াবে। কিন্তু সুশান্তর কোনো খোঁজ ছিল না। ইস্কুলের বন্ধু জয়দেব বিপ্লবের স্বপ্ন নিয়ে বেরিয়েছিল ঘর ছেড়ে। জেল খেটে মুক্ত হয়ে বড় চাকরিতে ঢুকেছিল। তার সঙ্গে অতনুর দেখা হয়েছিল আচমকা এক কাফেতে। সে অনেকের খোঁজ নিয়েছিল। যেন অতনু সব জানে। অতনু সাধারণ সরকারি চাকরি করে উপরে উঠেছে প্রোমোশনে প্রোমোশনে। বিপ্লব করতে যায়নি, জেল খাটেনি, খুব বড় চাকরি করেনি, শুধু সন্তান মানুষ করেছে। তার পক্ষে খোঁজ রাখা সম্ভব ছিল বন্ধুরা কে কোথায় কী করছে। জয়দেবকে সুশান্তর কথা জিজ্ঞেস করেছিল অতনু। জয়দেব বলেছিল, চেনে না।

একই পার্টি, চেন না কেন জয়দেব?

জয়দেব বলেছিল, কত ছেলে কতদিকে কাজ করতে গিয়েছিল, সে ছিল বীরভূম, সুশান্ত যদি বীরভূমে যেত হয়তো চেনা হতো।

জয়দেব পড়ত বিদ্যাসাগর কলেজে। সুশান্তকে তাই চিনতই না সহপাঠী হিশেবে। অতনুর ইস্কুলের বন্ধু জয়দেব, কলেজের বন্ধু সুশান্ত এবং অফিস কলিগ মনোরঞ্জন। মনোরঞ্জন সমস্ত জীবন তত্ত্ব বিচার করেই কাটিয়ে গেল। বিপ্লব কেন হয়নি, তা তত্ত্বসহ বুঝিয়ে দেবে মনোরঞ্জন মজুমদার। সে বিপ্লবের ঝুলি বয়েই নিশ্চিন্ত জীবন কাটিয়েছে। বাড়ি করেছে, সংসার করেছে। সতর্ক হয়ে অনেক বিপ্লবীয়ানা দেখিয়েছে। অনেকের খোঁজ পেয়েছিল অতনু। শুধু সুশান্তর পায়নি। ভেবেছিল বেঁচে নেই সুশান্ত। ভাবতেই পারেনি 'সংক্রান্তি' পত্রিকা আবার বের হচ্ছে। তার ভিতরে গ্রামের কথাই থাকে। চাষির কথা, জেলের কথা, খেতমজুরের কথা লেখা হয়। যাদের নিয়ে বিপ্লব করতে গিয়েছিল তাদের দুঃখের কথা নিয়েই 'সংক্রান্তি'। একটা সময় থেকে আর একটা সময়ে যাওয়ার সন্ধিক্ষণ।

হারিয়ে যাওয়া সুশান্তর দেখা পেল সে শিয়ালদা স্টেশনে, কাঁধে আধ ময়লা ঝোলা ব্যাগ, মাথার চুল অনেকটা ঝরে গেছে, দীর্ঘকায় সুশান্ত যাবে বেলঘরিয়া। আসছে প্রেস থেকে। প্রেস বউবাজারে। অতনুকে সে-ই চিনেছিল, অতনু, আমি সুশান্ত, অতনু ভুলে গেলি আমাকে?

অতনু অবাক হয়ে সুশান্তর দিকে তাকিয়ে ছিল। চেনা যায় কি? সেই সময় আর এই সময় কি এক?

সময় তো থেমে নেই। সুশান্ত, সুশান্ত, কোন সুশান্ত? সন্ধের কোলাহল থেমে গেল, স্থবির হয়ে গেল চারপাশ। অতনু সব কিছু ফিরিয়ে আনতে চাইছিল। প্রায় চল্লিশ বছর অতীত থেকে দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে ছিল। আবার দেখা হলো? কথা ছিল নাকি বন্ধু?

তিন

আয় ভাইডি হাটে যাই
ওই লিচুডা কিনে খাই
ওই লিচুডা পোকড়া
মা-ঝি ঝোকড়া।

লতা, বহ্নিলতার বয়স বছর দশ। সস্তার ফুল ছাপ নতুন ফ্রক পরা। কোমরের ফিতে দাঁতে কাটা তার অভ্যেস। পায়ে নতুন হাওয়াই। বিশ্বনাথ কিনে দিয়েছে হয়তো। এপ্রিলের কলকাতায় নগ্ন পায়ে হাঁটা কঠিন। তাদের দ্বীপে কত বাড়িতে সবদিন ভাত হয় না। নোনা জল নোনা মাটি। ধান হয় একবার। আবার বান হলে সেই ধানখেতে নোনা জল ঢুকে সব শেষ করে দিয়ে যায়। তাই হয়েছে মা। তোমাদের কলকাতায় তো বাঁধ নেই যে ভাঙবে, জমি নেই যে ভাসাবে নোনা জলে, ঝড়-বিষ্টি হয় না।

হয় ঝড়-জল। কিন্তু কলকাতায় কতটা কী হতে পারে? দু-একটা গাছ পড়ে, ডাল ভাঙে। একবার গাছের ডাল ভেঙে পড়েছিল একটি নীল মারুতি গাড়ির ওপর। তা নিয়ে কত খবর। টিভিতে দেখা গিয়েছিল তা। কেন কর্পোরেশন সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটিকে উদ্ধার করেনি। মাঝেমধ্যে ঝড়ে কিছু হয় বটে, তেমন কিছু হয় না। হ্যাঁ, বর্ষায় জীর্ণ বাড়ি ভেঙে পড়ে মারা যায় কিছু নিরুপায় মানুষ। তা একদিনের খবর। পরের দিনে ভুলে যাওয়া। একবার কালবৈশাখী ঝড় এসেছিল দুপুরে। সে বাড়ি ফিরেছিল অনেক রাতে। মেইন লাইনে ট্রেনের তার ছিঁড়েছিল। বাস ছিল কম। তবু ফিরতে পেরেছিল অনেক কষ্ট করে। কলকাতায় তো আবাদী জমি নেই যে বাঁধ ভেঙে নোনা জল ঢুকে কয়েক বছরের মতো নষ্ট করে দেবে জীবন জীবিকা। সুন্দরবনের ঝড়-বন্যা ভাসিয়ে নিয়ে যায় কত জনকে। তাদের কেউ ফিরতে পারে, কেউ পারে না। ভাদ্রমাসের ষাঁড়া-ষাঁড়ি বানের কথা বলে সুন্দরবনের বলাইহরি। ভাদ্রমাস অভাবের মাস। সারা বছরের অভাব ডেকে আনেও সেই ভাদ্র মাসের বান, ঝড়-বাদল। মেয়ে ক্লাস ফোরে উঠেছিল। ঝড়ে তাদের ইস্কুল উড়ে গেছে। মিড-ডে-মিল, উহু ইস্কুলে তো খেতে দিত না। তবে দেবে তা শোনা যাচ্ছে অনেক দিন। সরকারের তো আঠেরো মাসে বছর। ঝড়ে চাল উড়ে গিয়ে ইস্কুল নেই, মাস্টার আছে ভুজঙ্গ স্যার। তিনি পঞ্চায়েতে গিয়ে বসে থাকেন বলেছিল বলাই। ইস্কুল নেই, কিন্তু মাস্টারের বেতন আছে। সেদিন হাসনাবাদের বিশ্বনাথ গায়েন এবং মথুরগঞ্জের বলাইহরি মৃধা সকলে ছিল বেলঘরিয়ায়। কত রাত অবধি কথা হয়েছিল। মেয়েটা ঢুলতে ঢুলতে ঘুমিয়ে পড়েছিল। বলাইহরি বলছিল, মা, দিয়ে গেলাম, আমার আর একটা আছে, ছেলে, এইটিই বড়, পড়ায় মাথা ছেল, কিন্তু সব ইচ্ছে তো পূরণ হয় না, পেটপুরে খেতেই পায় না, তো পড়া, শিখায়ে পড়ায়ে নেবেন মা, আমি আর কী বলব।

বিশ্বনাথ গায়েন হাসনাবাদের একটি ইস্কুলে পড়ায়। নক্সালবাড়ি বিপ্লবী আন্দোলনে ছিল। এখনো যোগাযোগ রাখে সুন্দরবনের মানুষের সঙ্গে। ঝড়-বাদল হলে সে অনেকবার গেছে রিলিফ নিয়ে। পঞ্চায়েতের সঙ্গে তা নিয়ে গোলমাল হয়েছে। পঞ্চায়েত চায় সবটা নিজের হাতে থাকুক। বাইরের কাউকে ঢুকতে দেবে না ত্রাণের কাজে। সরকারি দল এমন ভাবে সব কিছু নিজের কাছে রাখতে চায় যে ইচ্ছে থাকলেও কিছু

করা যাবে না। বাইরে থেকে যে ত্রাণসামগ্রী আসছে, সবই পঞ্চায়েতে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতই তা বিলি করছে। তাতে কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না। আগে পার্টির খাস লোক তারপর অন্যরা। এমনি তো হচ্ছেই অনেকদিন ধরে। এইটাই রীতি। সবাই তাই পার্টির পতাকা কাঁধে নেয়। যে নেয় না, তার কপাল খারাপ।

বলাইহরি বলে, বান উঠলে জমির যা দশা হয়, জমি ঠিক করতি পরের বছরের বর্ষার জলের জন্যি বসি থাকতি হয়। গাঙ উঠে আসে জমিনে, নুন আর পলিতে ভর্তি হয়ে যায়, উদিকে সব অমন হয়, রিলিফ ছাড়া বাঁচার উপায় নাই।

যে কথা বহু রাত অবধি হতে থাকে, সে কথা অনেক বছর আগে তাদের যৌবন কালে শুনত তারা গাঙ পানির নোনা দেশ আর বন-পাহাড়ে বিপ্লব করতে গিয়ে। বদলায়নি কিছুই। অভাব, অন্নহীন জীবন সবই রয়ে গেছে। পৃথিবীর গা থেকে মুছবে না বোধ হয় কোনো দিন। হ্যাঁ, আছেই তো, ক'বছর আগে ঝাড় গ্রামের বেলপাহাড়ি থেকে অনেক ভিতরে আদিবাসীগ্রামে না খেয়ে মরছিল মানুষ। খবর হলে সেই একই কথা, না খেয়ে মরেনি, অসুখে মরেছে। অসুখ যে অপুষ্টি আর না খাওয়া থেকে হয়েছে তা কে বলবে? কিছু মানুষ জন্মায় অনন্ত দুর্ভিক্ষ নিয়ে। এ তাদের ভবিতব্য। খন্ডন হবে কবে তা কেউ জানে না। তারা যেন এক আলাদা ভারতের মানুষ। মূল ভারত তাদের নিয়ে ভাবতে চায় না।

মেয়েটা মেঝের ওপর লুটিয়ে আছে। মাথার ওপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। অপুষ্টিতে ভরা হাড়–পাঁজরা বের করা শরীর। বহুদিন বাদে পেটপুরে খেয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমের ধকলে কুঁকড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক রাত অবধি তারা শুনল কত রকম সব কথা। কতদিন বাদে শুনল। এখন তো কলেজ স্ট্রিট, প্রেস আর বাড়ি। মাঝেমধ্যে পুরোনদের কাউকে কাউকে দেখতে পায়। দেখা হয়ে যায়। অনেকেই সরকারের ছায়ায় সুখে আছে। অনেকেই নানা ভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। উপন্যাস লিখেছে, আত্মজীবনী লিখেছে সেই লাল টুকটুকে দিনের। জেলখানার অভিজ্ঞতার কথা লিখেছে। আবার সব ভুলে গিয়ে সংসার করছে দারুণ। কর্পোরেটের দাসত্ব করছে। সরকারি আমলা হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ করতে গিয়ে গরিব মানুষকে উচ্ছেদ করছে। ঘুষও নিচ্ছে। আবার সৎ হয়েও বাঁচতে চাইছে। এর মানে ঝাঁকের কই ঝাঁকে মিশে গেছে। জগতের চলন-বলনের সঙ্গে এক হয়ে গেছে। শুধু তারা কিছুই করতে পারেনি নিজেদের পরাজিত মনে করা ছাড়া। পরদিন ভোরে বিশ্বনাথ আর বলাই চলে যায়। মেয়েটি তখনো ঘুমোচ্ছে। ডাকতে গিয়েছিল বহ্নিশিখা, কিন্তু বারণ করেছিল বলাই, থাক মা, ও কোনোদিন আমাদের কাছ ছাড়া হয়নি, এখন কান্নাকাটি আরম্ভ করবে, আমিও দোটানায় পড়ব, থাক ঘুমোক, পেটপুরে তো খেতে পাবে।

অনেক বেলায় উঠেছিল সে। বাবা আর বিশ্বনাথ কাকাকে না দেখে কেমন হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। এত সময়ে যেন বুঝেছিল সমস্তটা। বুঝতে পেরেছিল বাবা আর হাসনাবাদের কাকা তাকে রেখে গেছে। সে চুপ করে বসেছিল। বহ্নিশিখা দেখছিল তাকে একটু তফাত থেকে। সে অনেকক্ষণ বাদে জিজ্ঞেস করল, বাবা চলি গেছে?

হ্যাঁ, ভোরে না গেলে বেলা থাকতে পৌঁছতে পারবে না। বলেছিল বহ্নিশিখা।

বাড়ি চলি গেছে? মেয়ে আবার জিজ্ঞেস করে।

তাই তো বলল। বহ্নিশিখা বলেছিল।

সে নিঃশব্দে চোখ মুছতে আরম্ভ করেছিল, তারপর বলেছিল, আমার মন কেমন করতেছে গো মা, বাবা আমারে ফেলে চলি গেল!

আসবে আবার, এবার থেকে তুই আমাদের কাছে থাকবি। বহ্নিশিখা এগিয়ে এসে তার রুক্ষ চুলের জটে হাত দিয়েছিল, ইস কী হয়েছে, বটের ঝুরি, চুলে তেল শ্যাম্পু পড়েনি কতদিন।

সে যেন সুন্দরবনের বাঘিনীর সন্তান, গ্রীবা ঘুরিয়ে বলল, আমি বাড়ি যাব।

যাবি যাবি, এখন আমার কাছে থাক। বহ্নিশিখা তার পিঠে হাত রাখে।

না গো, আমি মথুরগঞ্জ ফিরে যাব। বলে সে চোখ মুছতে থাকে।

আচ্ছা যাবি, তোর বাবা আসুক। সুশান্ত বলেছিল।

সে গোঁজ হয়ে বসে রইল। বহ্নিশিখা কী করবে বুঝতে পারে না। এই মেয়ে যদি সত্যি বাড়ির জন্য গোঁ ধরে সে করবে কী? হাসনাবাদে গিয়ে বিশ্বনাথ গায়েনের কাছে দিয়ে আসতে হবে। কিন্তু বিশ্বনাথ যে বলেছিল ওর বাবার উপায় নেই তাই মেয়েকে নিয়ে আসছে কলকাতায়। খেয়ে বাঁচবে তো। মেয়ে চুপ করে বসে থাকে অনেক সময়, তারপর নিজে নিজেই বলল, সে অনেক দূর গো মা, গাঙের পর গাঙ পারিয়ে যেতি হয়, হাসনাবাদের কাকা ছাড়া কেডা চেনবে?

কথা হচ্ছিল বহ্নিশিখা আর মেয়েতে। সুশান্ত দূরে বসেছিল। সে দূর থেকেই বলল, আমাদের পছন্দ হচ্ছে না তোর, আমরা কি খারাপ লোক?

সে লজ্জিত হয় যেন। মুখ নিচু করে মাথা নাড়ে, বলে, আমার যে ভাইয়ের জন্যি মন কেমন করতেছে গো, আমি কী করব বলো, ভাইডারে আমি ঘুম পাড়াই শোলোক বলে।

আহা! বুক ভরে গিয়েছিল বহ্নিশিখার। শোক বলা কাজলাদিদি। কেমন ছলছলে চোখে তাকিয়ে আছে। বাঁশবাগানের মাথার ওপর চাঁদ যেন না ওঠে আজ।

সুশান্ত বলে, ভাই ভালো থাকবে, এরপর যখন যাবি, নিয়ে আসবি ভাইকে।

মাথা নাড়ে মেয়ে, বলে, হবেনি গো, ছুটো খুব, সে মা ছাড়া থাকতি পারবেনি, মার কাছে ঘুমায়, মা তারে ঘুম পাড়ায়, মা ছাড়া থাকবেনি,

ঘোম আয় ঘোম আয় ঘোম গাছের পাতা
রাজবাড়িতে আয় ঘোম হস্তি ঘোড়ার মাথা
গিরস্তবাড়িতে আয় ঘোম শেলের পহর ডাক,
আমার মনির চোখে ঘোম নাই গো
ঘোম দিয়ে দিয়ে যাক।

মা তুমি শোলোক জানো? মেয়ে জিজ্ঞেস করে।
বহ্নিশিখা বলে, নারে আমি জানি না, তুই আমারে শিখিয়ে দিস।
আমি আর কত জানি, সব জানে আমার মা আর ঠাকমা, আগে ভাই মা ঠাকমা ছাড়া ঘুমাত না, আমিও ঘুমাতাম ঠাকমার শোলোক শুনতে শুনতে, এখন আমিও শোলোক বলি।
কী শোক? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করে।

মেয়ে গুনগুন করে,
হলদি গাছের গোড়ারে
লাল পাখিডা ডায়েরে
অত ডাহা ডাহিস না
শ্যামের গলা ভাঙিসনে।
পিচিং ফিচিং কাঁদিসনে।

সুশান্ত বলে, তুই তো মা ছাড়া থাকতে পারবি তো?
হ্যাঁ, পারব, আমি তো বড় হই গিছি। মেয়ে বলল।
সুশান্ত আর সেই লতার কথার ভিতরে বহ্নিশিখা শুধু তার গায়ে হাত বুলিয়ে যাচ্ছিল। হাড়জিরে মেয়ে, তবু কত নরম। ফুলের গায়ে হাতের আঙুল ছুঁইয়ে দিচ্ছিল যেন বহ্নিশিখা। সে এতটা জীবন কখনো এমনি নিজের মতো করে হাত ছোঁয়াতে পারেনি এমন কারো গায়ে। আহা কী সুখ! সুশান্ত তখন সেই বালিকাকে বশ করে ফেলেছে প্রায়, বলছে, তুই মোটেই বড় হসনি তা আমি বুঝে গেছি, বুঝলি।

কী করে বুঝলে? মেয়ে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

বড় হলে কি মন কেমন করছে বলতিস খুকি? সুশান্ত বলেছে।

লতা বলেছিল, খুকি না, আমার একটা নাম লতা, আর একটা নাম কবিতা, আমার দাদু নিতাইহরি মিধা দেছে কবিতা, মা বাপে দেছে লতা, কিন্তু আমার যে ভাইয়ের জন্যি মন কেমন করতেছে গো।

একখান নৌকা
দুইখান নৌকা
তিনখান নৌকা
নৌকা সারি সারি
তারপরে উঠে দেখি
লালবিবির বাড়ি।

ও ভাই আমরা লালবিবির বাড়ি যাব, ঘুমা, ভাইরে ঘুম পাড়াই আমি। বলতে থাকে মেয়ে।
আচ্ছা, ভাইকে নিয়ে আসতে বলব তোর বাবাকে। বলেছিল সুশান্ত।
ভাই আসপে না, মারে ছাড়া থাকতি পারে না। সে বলেছিল।
আচ্ছা তোর মাকে নিয়ে আসব তাহলে। সুশান্ত বলেছিল।
সে বলেছিল, মা আসপে না, ঠাকমা দাদুরে কে দ্যাখপে?
সুশান্ত বলেছিল, তাদের যদি নিয়ে আসি।
হবে না, গাঙ-পানির দেশ ছাড়া তারা থাকতি পারবেই না, গেরাম থেকে কুথাও যাবে না, শুধু বলে বিরামপুরার কঠিন দেশে যেতি পারত যদি আর একবার! বিজ্ঞের মতো বলেছিল সেই মেয়ে।
তাহলে তুই একা থাক, আমাদের কাছে থাক। সুশান্ত বলেছিল।
লতা গুনগুন করল,

চাল কুটতে গিছিলাম
একটা ডিম পেয়েছিলাম।
সেই ডিমডা কই?
কাকে খেইছে।
সেই কাকটা কই?
ডালে বসেছে।
সেই ডালডা কই?

আমার ঠাম্মা যমুনাবুড়ি সারাদিন এমনি বলে, তার মতোন কেউ জানে না। বলতে বলতে সে বহ্নিশিখার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল, হ্যাঁ গো মা, তুমি আমাদ্দের গাঁয় যাবা?
যাব, যাব। বহ্নিশিখা বলে।
গাঙ দেখলি ভয় পাবা না? চোখের সামনে তর্জনী তুলে বলল সে।
না, পাব না, আর তুই থাকলে ভয় কী? বলে বহ্নিশিখা তার গাল টিপে দিল। বড্ড মায়া জন্মে যাচ্ছে যে। এমন কথা ইহজীবনে শোনেনি সে।
তখন মেয়ে বলছে তর্জনী তুলে বলল, গাঙ গেল, গাঙের বাঘিনী দেখলি বুক কাঁপবে না?

চার

বহ্নিশিখা সেদিন ইস্কুলে গেল না। লতাকে বলল, তোকে আমি সাবান শ্যাম্পু দিচ্ছি, পেস্ট ব্রাশ দিচ্ছি, দাঁত ব্রাশ করে ভালো করে স্নান করে নে, তারপর খাবি।

ও মা, এখনই আমি খাব, বেলা হইনি, কাজটাজ করি আগে। লতা পাকা বুড়ির মতো বলল, সক্কালেই খাওয়া!

কাজ করতে হবে না আজ, কাচা জামা আছে? বহ্নিশিখা জিজ্ঞেস করেছিল।

তার কোলের কাছেই পুটুলিটা ছিল। তা খুলল বহ্নিশিখা। রঙিন শালোয়ার কামিজ। টপ আর লং স্কারট। দামি খুব। এগুলো পুটুলির ভিতরে রেখে সে কেন ওই ফ্রক পরে এসেছে? কারণ ওটা যে নতুন। হাসনাবাদের কাকা কিনে দেছে। লং স্কারট আর দামি শালোয়ার কামিজ কোন একটা ঝড়ের পর রিলিফে পাওয়া। পঞ্চায়েতে এসেছিল, পঞ্চায়েত দেছে। পরা হয় না। অনেক বড়। ঢোলা হয়। লতা বলল, ওর ভিতরে আমরা সবাই ঢুকে যাব গো, আমি, মা, ভাই, বাবা, কী করে পরব, বড়লোকের বড় জামা?

বহ্নি দেখল তুলে। সত্যি খুব বড়। ব্যবহার করা শালোয়ার কামিজ। যার ছিল সে অতি পৃথুলা, ক্ষীর ননী খাওয়া মেদবহুল কেউ। দান করে দিয়েছিল বান-বন্যায় সর্বস্বান্ত মানুষের জন্য, সেইটা গিয়ে পৌঁছেছে এদের কাছে। সঙ্গে নিয়ে এসেছে সুন্দরবনের মেয়ে, যদি দর্জিকে দিয়ে কাটিয়ে নেওয়া যায়। সুশান্তকে তখন বহ্নিশিখা পাঠাল, যাও তো, মার্কেট খুলেছে কি না দেখো, স্মল সাইজ বলবে, ফ্রক আর শালোয়ার কুর্তি নিয়ে এসো দুটো করে, স্নান করে পরবে কী, আমার শাড়ি?

লতা বলল, হাঁ পরব মা, তুমার ম্যাক্সি নেই, মারডা তো আমি পড়ি। কীভাবে ব্রাশ করতে হয় সে জানে। হাসনাবাদের গায়েন কাকার বাড়িতে দেখেছে। তারা তো ঘুটের ছাই দিয়ে দাঁত মাজে। বাবা নুন তেল দিয়ে মাজে। মা মুখে দেয় তামাক পোড়া। ব্রাশ করে চোখমুখ ধুয়ে আসতে বহ্নিশিখা তাকে বিস্কুট দেয়। আর বিস্কুট দেখে সে কেঁদে ফেলে, বলে, ভাই বায়না করে, বাবা দেয় না।

মা বাবা ভাই বোন এক সঙ্গে ছিল। একজন আলাদা হয়ে কলকাতা চলে এসেছে। বহ্নিশিখা সুশান্তকে বলে, একে দিয়ে কাজ করাবে কী করে?

সুশান্ত চুপ করে থাকে। বহ্নিশিখা বলে, শিশু শ্রমিক তো আইনত নিষিদ্ধ।

সে তো আমরা জানতামই, গায়েন বলেছিল বছর দশ। সুশান্ত মৃদু গলায় বলে।
বহ্নিশিখা বলেছিল, তাহলে একে নিয়ে আমরা করব কী?
সুশান্ত বলেছিল, ফিরিয়ে দেবে?
আর এক জায়গায় দিয়ে দেবে ওর বাবা, খাওয়ানোর ক্ষমতা নেই। বহ্নিশিখা বলেছিল।
সুশান্ত বলেছিল, আমরা তাহলে করব কী?
বহ্নিশিখা বলেছিল,

ট্যাংরা মাছের ট্যানট্যানানি
পাঙাস মাছের ধাড়ি
কুন পতে যাব আমি
রাঙাদিদির বাড়ি?

কত জানে গো মেয়েটা, মুখে যেন খই ফুটছে, সব নাকি ওর মা ঠাকুমা বলে, সে নাকি মুখে মুখে বানায়।

সুশান্ত বলে, তুমি অযোদ্ধ্যা পাহাড়ে শোনোনি?

ঝুমুরগান, ভাদু গান। বিড়বিড় করে বহ্নিশিখা, সব ভুলে গেছি গো।

বহ্নিশিখা আর সুশান্তর ঘুম ছিল না। মেয়েটাকে নিয়ে সারাদিন কেটেছে বহ্নিশিখার। এখন সে ঘুমোচ্ছে। তার জন্য একটা ঘরই গুছিয়ে দিয়েছে সে। গাঙের ধারের এই মেয়ে এসে ঝড় তুলেছে তাদের দুজনের ভিতর। কত বছর বাদে যৌবনবেলার উষ্ণতা ফিরে এসেছে যেন। বহ্নি সুশান্তর গলা জড়িয়ে বলল, ও আমাকে মা ডাকছে গো, ও সেই অযোদ্ধ্যা পাহাড়, জয়চন্ডী পাহাড় থেকে মা ডাকতে ডাকতে এ বাড়ি এসে উঠেছে।

সুশান্ত জিজ্ঞেস করে, কী বলতে চাও, বলো, বলো।

বহ্নিশিখা বলল, আমাদের হোক না ও, আমাদের তো কেউ নেই।

সুশান্ত বলল, ওর মা বাবা ভাববে শহরের বাবু কেড়ে নিল, আমরা বলতাম না শহর কেড়ে নেয়, গ্রাম শুষে নিয়ে শহর নিজেকে সাজায়, তুমি বাড়ি সাজাবে, সংসার সাজাবে ওকে দিয়ে?

তা কেন হবে, কেড়ে নেব কেন, ওর মা বাবাকে বলেই নেব। বহ্নিশিখা বলেছিল।

যদি না দেয়? সুশান্ত কঠিন প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছিল।

বহ্নিশিখা বলল, নেব মানে সত্যিই তো নেব না, আমাকেও মা বলছে, আমি মা হয়ে থাকি।

সুশান্ত বহ্নি সেদিন কতরাত অবধি জেগেছিল। শেষে সুশান্ত বলল, তোমাকে মা বলছে বলুক, আমাকে পিসে কিংবা মেসো বলুক, জেঠা বলতে পারে, আমি বাবা হয়ে গেলে ওরা ভাববে আমরা সত্যিই কেড়ে নিলাম। কেড়ে নেব না বহ্নি, হাত পাতব যদি দেয় ওই বলাইহরি আর ওর বউ, লতার মা।

তাইই হয়েছিল। সুশান্ত চলে গিয়েছিল হাসনাবাদ। সেখান থেকে বিশ্বনাথ গায়েনকে নিয়ে গাঙ পার হয়ে পার-হাসনাবাদ থেকে ট্রেকারে চেপে ভাঙাচোরা রাস্তায় দুলতে দুলতে গৌড়েশ্বর নদীঘাট অবধি। সেই নদী খেয়ায় পার হয়ে আবার ট্রেকার। চলছে তো চলছে, দুধারে মেছো ভেড়ি, ধানকাটা মাঠ, বহুদূর বিস্তৃত গ্রাম ছায়া। বাতাসে জলের গন্ধ। বোঝা যায় ওই ভূখণ্ড ঘিরে আছে গাঙের পর গাঙ, জল আর জল। ট্রেকার এসে থামল তিন নদীর মোহনায়। রায়মঙ্গল, কালিন্দী আর গৌড়েশ্বর। কালিন্দী আর রায়মঙ্গল সমুদ্রের মতো প্রায়। গৌড়েশ্বরের পুব কোণে বাংলাদেশ দেখা যায়। রায়মঙ্গল ধরেই তারা যাবে। সেই নদী দেখে ভয় করে। •

চলবে...

Telangana Map

একনজরে তেলেঙ্গানা

দেশ	ভারত
অঞ্চল	দক্ষিণ ভারত
রাজধানী	হায়দ্রাবাদ
জেলা	৩৩টি
প্রতিষ্ঠা	২ জুন ২০১৪
সরকার	
• রাজ্যপাল	তামিলিসাই সৌন্দরারাজন
• মুখ্যমন্ত্রী	কে. চন্দ্রশেখর রাও
• বিধানসভা	দ্বিকক্ষীয় (১১৯ + ৪০ আসন)
• লোকসভা	১৭
• হাইকোর্ট	হায়দ্রাবাদ হাইকোর্ট
আয়তন	
• মোট	১,১৪,৮৪০ বর্গকিমি (৪৪,৩৪০ বর্গমাইল)
• এলাকা ক্রম	১১তম
জনসংখ্যা (২০১১)	
• মোট	৩,৫২,৮৬,৭৫৭
• ক্রম	১২তম
• ঘনত্ব	৩১০/ বর্গকিমি (৮০০/ বর্গমাইল)
• সাক্ষরতা	৬৬.৪৬%
সময় অঞ্চল	ভারতীয় প্রমাণ সময় (ইউটিসি+০৫:৩০)
আইএসও	৩১৬৬ কোড- এখনো নির্ধারিত হয়নি
সরকারি ভাষা	তেলেগু, উর্দু
ওয়েবসাইট	www.telangana.gov.in

তামিলিসাই সৌন্দরারাজন
রাজ্যপাল

কে. চন্দ্রশেখর রাও
মুখ্যমন্ত্রী

কেন্দ্রবিন্দু

তেলেঙ্গানা

শান্ত জাবালি

তেলেঙ্গানা ভারতের সর্বকনিষ্ঠ রাজ্য। ২ জুন ২০১৪ সাল থেকে রাজ্যের প্রশাসনিক যাত্রা শুরু হয়। রাজ্যেটি সংখ্যায় কনিষ্ঠ হলেও এর রয়েছে আড়াই হাজার বছরেরও পুরোনো সমৃদ্ধশালী সাংস্কৃতিক-সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনীতির এক গৌরবময় ইতিহাস। প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে এই অঞ্চলে পাওয়া লৌহ ধাতুগুলোর বয়স প্রায় দুই হাজার বছরের পুরোনো, এছাড়া তেলেঙ্গানার বিভিন্ন জেলাজুড়ে মেগালিথিক (প্রাচীন পাথর) এর তৈরি অসংখ্য প্রাচীন ভবন-স্মৃতিস্তম্ভ-ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘরের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, যার থেকে প্রমাণিত হয় এখানে হাজার বছর পূর্ব থেকে মানুষ বসবাস করে আসছে। প্রাচীন ভারতের ১৬টি জনপদের মধ্যে অসমাকা জনপদ তেলেঙ্গানার মধ্যে পাওয়া যায়, যা দ্বারা প্রমাণিত হয় অতীতেও এখানে উন্নত জীবনধারার সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল

সাতবাহন, ভাকাটক, ইক্ষভাকুস, বিষ্ণুকুন্দিন, চালুক্য, কাকাতিয়াদের মতো শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলোর শাসন তেলেঙ্গানার মধ্যে পাওয়া যায়। পুরাপলীয় যুগে এই অঞ্চলে মানব বসতির প্রমাণ মেলে। প্রাচীনকাল থেকে এই অঞ্চলের স্বতন্ত্র মুদ্রা ব্যবস্থার প্রচলন ছিল, যা এই উপমহাদেশের প্রথম ছাপাঙ্কিত মুদ্রা। পৌরাণিক গ্রন্থ, বৌদ্ধ গ্রন্থ, ম্যাগেথেনিস ও আর্যদের লেখনীতে তেলেঙ্গানার ইতিহাস সম্পর্কে আরো বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়।

খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই অঞ্চলে সাতবাহনদের শাসন শুরু হয়। প্রথমদিকে রাজ্যের রাজধানী কোটালিঙ্গলা থাকলেও পরবর্তীতে পৈঠান এবং অমরাবতী (ধরানিকোটা)-তে স্থানান্তরিত হয়। লিপি পাঠোদ্ধার থেকে অনুমান করা হয়, তৎকালীন রাজ্যটির তিনদিকে সমুদ্রবেষ্টিত ভূমি ছিল।

খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাতবাহনদের পতনের পর বৃহৎ রাজ্যটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভিন্ন শাসকশ্রেণি দ্বারা প্রায় ছয়শ কি সাতশ শতাব্দী পর্যন্ত শাসিত হয়েছিল। এই সময়কে গবেষকরা অন্ধকার যুগ বলে মনে করলেও অন্য গবেষকদের মতামত, এই সময়কাল নিয়ে এখনো পর্যাপ্ত গবেষণার সংকট রয়েছে।

৯৫০ সালের দিকে কাকাতিয়া রাজবংশ ক্ষুদ্র রাজ্য গুলোর মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সমগ্র তেলেগু ভাষাভাষী অঞ্চলগুলোকে একত্রিত করে বৃহৎ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। যা পরবর্তীতে তিনশ বছরেরও অধিক স্থায়িত্ব লাভ করে।

তেলেঙ্গানার মধ্যে উপমহাদেশের প্রথম নারী শাসক হিসেবে 'রুদ্রমাদেবী'র প্রমাণ পাওয়া যায়। যিনি এই অঞ্চলের শক্তিশালী শাসক ছিলেন। এছাড়াও তেলেঙ্গানার উল্লেখযোগ্য শাসকদের মধ্যে গণপতিদেব, রুদ্রদেব এবং প্রতাপরুদ্র অন্যতম।

কাকাতিয়ারা তাদের দীর্ঘ শাসনামলে অসংখ্য জন প্রশংসিত কাজের উপহার দিয়েছেন। যেমন–বিস্তৃত এলাকাকে সেচ প্রকল্পের আওতায় আনা, আবাদি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি, স্থাপত্যশিল্প, চিত্রশিল্প। এছাড়া এই সময়ে রাজ্যের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ার সাথে তা সংস্কৃতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। পরবর্তীতে দিল্লি সুলতানের আক্রমনের মধ্যে দিয়ে কাকাতিয়াদের শাসন সমাপ্ত হয়।

মুঘল সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত খণ্ড-বিখণ্ড শাসনের মধ্য দিয়ে শাসিত হয় তেলেঙ্গানা। মুঘলরা রাজ্যটিকে হায়দ্রাবাদ নামে নামকরণ করেন। ১৭৪৮ সালে সিংহাসনে উত্তরাধিকার নিয়ে মুঘলদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হলে তখন ব্রিটিশদের সম্পৃক্ততা বাড়তে থাকে। পর্যায়ক্রমে শাসনের কেন্দ্রে চলে আসে ব্রিটিশরা। পরবর্তী সেই শাসন থেকে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের সাথে রাজ্যটিও স্বাধীনতা লাভ করে।

স্বাধীনতার পর তেলেঙ্গানাকে অন্ধ্র প্রদেশের সাথে একীভূত করা হয়। অবশেষে ২০১৪ সালে ২ ই জুন অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে পৃথক হয়ে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে তেলেঙ্গানার যাত্রা শুরু হয়।

ভৌগোলিক অবস্থান

তেলেঙ্গানার উত্তরে মহারাষ্ট্র রাজ্য, উত্তর-পূর্বে ছত্তিশগড় ও ওড়িশা, দক্ষিণ-পূর্ব ও দক্ষিণে অন্ধ্রপ্রদেশ এবং পশ্চিমে কর্ণাটক রাজ্য। তেলেঙ্গানা এবং অন্ধ্রপ্রদেশ উভয়ের রাজধানী হায়দ্রাবাদ। ভারতের দক্ষিণ-মধ্য ভূমিতে তেলেঙ্গানার ভৌগোলিক অবস্থান। এর ভূমি কাঠামো সমতল ভূমি থেকে তুলনামূলক একটু উঁচু। উত্তরের দিকে তেলেঙ্গানা মালভূমি আর দক্ষিণ দিকে গোলকুন্ডা মালভূমি এর ভূমিকে আবৃত করে রেখেছে। উত্তরে গোদাবরী নদীর এবং দক্ষিণে কৃষ্ণা নদীর প্রবাহভূমিতে প্রাণের সঞ্চারণ ঘটায়। মালভূমি এলাকার গড় উচ্চতা ১৬০০ ফুট।

জনসংখ্যা

তেলেঙ্গানার আয়তন ১,১৪,৮৪০ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ৩৫, ২৮৬, ৭৫৭ (২০১১ সালের আদমশুমারি)। হিন্দুধর্ম ৮৬%, ইসলাম ১২.৪%, খ্রিষ্টধর্ম ১.২%,অন্যান্য ০.৪%

পর্যটন

ভ্রমণপ্রিয়দের জন্য বরাবরই পছন্দের প্রথম তালিকায় ভারতবর্ষ। তেলেঙ্গানার মন্দির, বন্য প্রকৃতি, পাহাড়, দুর্গ, লেক, অভয়ারণ্য পর্যটন শিল্পের অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান। ক্ষুদ্র পরিসরে কয়েকটি ভ্রমণ স্থানের বর্ণনা করা হলো–

মন্দির : ভারতকে মন্দিরের দেশও বলা হয়। বর্তমান বিশ্বে তারা প্রযুক্তি দুনিয়ার সাথে সমান তালে এগিয়ে যাচ্ছে। আইটি বিশেষজ্ঞ, সফটওয়্যার নির্মাতাদের এক উর্বর ভূমিতে পরিণত হয়েছে ভারত। তবে আপনি যখন একজন পর্যটক হিসেবে ভারতে ঘুরতে যাবেন, তখন দেখবেন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি, ধর্মীয় বৈচিত্র্যপূর্ণ এই দেশটির সাথে মন্দিরের ইতিহাস অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। পাহাড় কিংবা অভয়ারণ্য প্রকৃতির ভাঁজে সেখানকার কলা-কৃষ্টি-সংস্কার-আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের সাথে জড়িত রয়েছে মন্দিরের ইতিহাস। মন্দিরের ইতিহাস মানেই এই নয় আপনি সেখানকার ধর্মীয় বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠছেন বরং সেখানকার প্রাকৃতিক সংকট মোকাবিলা করে, যুদ্ধ-বিগ্রহ, দুর্গম জীবনে প্রাণের প্রদীপ সঞ্চারণে এই সকল আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাও জানতে পারবেন। তেলেঙ্গানার মন্দিরগুলো স্থাপত্যশিল্পের জন্য বিখ্যাত। যেমন, অনন্ত পদ্মনাভ স্বামী মন্দির, ভদ্রচালাম, বিড়লা মন্দির, চিলকুর বালাজি মন্দির, ডিচপল্লী রামলায়ম, জগন্নাথ মন্দির, পেদ্দম্মা মন্দির ইত্যাদি। এছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও রয়েছে, যেমন জৈন মন্দির, মক্কা মসজিদ, মেদাক চার্চ ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক ভূ-প্রকৃতি : সমুদ্রপ্রেমীরা তেলেঙ্গানাতে সমুদ্র না পেলেও লেক, আকাশচুম্বি জলপ্রপাত, প্রাণীদের অভয়ারণ্যগুলো নিঃসন্দেহে আপনাকে রোমাঞ্চকর অনুভূতি দেবে। এমনি কয়েকটি স্থান হলো–

১. অনন্তগিরি পাহাড় : অনন্তগিরি লাল মাটির পাহাড়, এখানে ট্রেইল করতে পারবেন। এখানে রয়েছে ছোট ছোট জলাধার, মিষ্টি জলের নদী, ঘনঘন গাছ। এটি তেলেঙ্গানা মানুষের কাছে প্রথম আকর্ষণীয় স্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২. বগাথা জলপ্রপাত : বগাথা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম জলপ্রপাত। এটি প্রায় ৯৮ ফুট লম্বা। এখানে জুন থেকে নভেম্বর পর্যন্ত ভ্রমণের সঠিক সময়।

৩. গায়ত্রী জলপ্রপাত : গায়ত্রী জলপ্রপাত কদম নদীর ওপরে অবস্থিত। জলপ্রপাতের উচ্চতা প্রায় ১০০ ফুট। জলপ্রপাতে পৌঁছাতে জঙ্গলাকীর্ণ প্রায় পাঁচ কিলোমিটার ট্রেকিং করতে হয়।

৪. মাল্লারাম বন : মাল্লারাম বনটির বয়স প্রায় ১.৪৫ বিলিয়ন বছর। প্রধানত কাঠগাছ দেখা যায়, পরিযায়ী পাখিরও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এখানে ২০০ বিলিয়ন বয়সেরও পাথর পাওয়া যায়। এই বনে আপনি ট্রেইল করতে পারবেন।

৫. টাইগার ফরেস্ট : তেলেঙ্গানাতে দুটি বাঘ সংরক্ষণাগার রয়েছে। তার মধ্যে ভারতের বৃহত্তম বাঘ সংরক্ষণাগার 'টাইগার ফরেস্ট'। এছাড়া অন্যান্য প্রাণীদেরও অভয়ারণ্য এই বন। যেমন হরিণ, বন্য কুকুর, চিতাবাঘ, বন্য বিড়াল ইত্যাদি।

এছাড়াও তেলেঙ্গানাতে রয়েছে ময়ূরী ইকো পার্ক, আলিসাগর জলাধার (লেক), পালাইর লেক, সিঙ্গুর ড্যাম জলাধার, পোচেরা জলপ্রপাত, পাখাল লেক, ওসমান সাগরলেক ইত্যাদি।

সংস্কৃতি

তেলেঙ্গানা রাজ্যটি প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বহুজাতিক ভাষা-সংস্কৃতির এক পরম মিলনস্থল। ভারত যে বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতির ধারক-বাহক তেলেঙ্গানা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর রাজধানী হায়দ্রাবাদের মধ্যে দিয়ে উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের যাতায়াতের করিডোর হওয়ায় এটি 'ক্ষুদ্র ভারত' হিসেবেও পরিচিতি পায়। সাতবাহনরা এই অঞ্চলে যে স্বনির্ভর গ্রাম্য অর্থনীতির বীজ রোপণ করেছিলেন, তার ধারা আজো বহমান।

ভারত ধ্রুপদী সংগীতের জন্য জগদ্‌বিখ্যাত। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের রচয়িতায় তেলেঙ্গানার শাস্ত্রকারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তেলেগুর সাহিত্যও ভারতবর্ষে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। তেলেগুর কবিতা-সাহিত্য-গল্প সাহিত্যপ্রেমীদের জন্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। তেলেগু ভাষার পাশাপাশি উর্দু ও ইংরেজি ভাষাতেও নিয়মিত সাহিত্য সাময়িকী বের হয়।

ক্ষমতার পালাবদলে নতুন শাসকরা বরাবরই তাদের নিজস্বতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছেন, ফলে নতুন-পুরাতনের মিলনে সংস্কৃতির মধুরতার ধারা তৈরি হয়। তেলেঙ্গানার ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ শাসনের কারণে পদ্ধতিগত-নিয়মতান্ত্রিকভাবে কলা-কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকতার সাথে সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিন্তু বর্তমানে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে মর্যাদা পাওয়ার পরে তেলেঙ্গানা তাঁর প্রাগৈতিহাসিক থেকে বর্তমান সকল সংস্কৃতি-কলা-কৃষ্টিকে ব্যাপকভাবে সংরক্ষণ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

শিল্প

তেলেঙ্গানা, ধ্রুপদী শিল্পকর্মের জন্য বিখ্যাত। কাকাতিয়াদের শাসনামলে 'পেরিনি শিবতাণ্ডভম' নামক বিশেষ নৃত্যপদ্ধতি ছিল। যেটাকে 'যোদ্ধাদের নৃত্য' বলা হয়। এটি বর্তমানে ধ্রুপদী নৃত্যছন্দ হিসেবে গণ্য করা হয়। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলের মানুষ তাদের জীবন সাংসারিক সংকট মোকাবিলা করার সংগ্রাম থেকে শ্রুতিগল্প নির্মাণ করতেন। এই গল্পের মিশ্র সংস্কৃতির একটি ধারা হচ্ছে 'ধুম ধাম'। যার মাধ্যমে তারা তাদের সংগ্রাম-জীবনযুদ্ধকে বর্ণনা করে মঞ্চনাটকের মাধ্যমে প্রকাশ করে।

গান শিল্পে অনন্য তেলেঙ্গানা। জনপ্রিয় 'যক্ষগান' এর একটি ধারা হচ্ছে 'চিন্দু ভাগবথম'। এটি সাধারণত মঞ্চনাটকে উপস্থাপন করা হয়। অঙ্গসজ্জা, নান্দনিক ট্রেডিশনাল পোশাক, সংগীত, তর্ক-বিতর্কের এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নৃত্য পরিবেশন করা হয়। এই নৃত্যটি বিশ্বজুড়ে অধিক সমাদৃত ও জনপ্রিয়। এছাড়াও কাওয়ালি গান, গজলের সুরে সৃষ্টিশীল মৌলিকত্ব পাওয়া যায়। বর্তমানে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সেগুলোকে নান্দনিকতার সঙ্গে সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

উৎসব

তেলেঙ্গানাতে উৎসব পালনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কিংবা ধর্মীয় অনুষ্ঠান যাই হোক হিন্দু-মুসলিম-খ্রিষ্টান-অন্যধর্ম সবাই আন্তরিকভাবে অংশগ্রহণ করে। উগাদি, শ্রীরাম নবমী, বোনালু, বিনায়ক চতুর্থী, দশরা, দীপাবলি, হোলি, মহা শিবরাত্রির মতো হিন্দুদের উৎসবগুলো আড়ম্বরপূর্ণ পরিবেশে, অত্যন্ত পবিত্রতা-ভক্তির সাথে পালন করা হয়। 'দশরা' তাদের প্রধান উৎসব। উৎসবটির ঐতিহাসিক-পরিবেশগত-সামাজিক-অর্থনৈতিক-ধর্মীয় তাৎপর্য রয়েছে। এই সময়ে তারা গানের মাধ্যমে পুরানের গল্প, সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উন্নয়নের গাঁথামালায় সুর প্রণয়ন করেন। 'মহরম'-কে তেলেঙ্গানাতে মুসলিমরা অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও এই আয়োজনে অংশগ্রহণ করেন।

চারু ও কারুশিল্প

চারু-কারুশিল্পে এক ধরনের শৈল্পিক স্বাতন্ত্র্য রয়েছে। মুদ্রা তৈরিতে তারা শিল্পাক্ষরের স্বাক্ষর রেখেছেন। এছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় তৈজসপত্র থেকে ব্যক্তিগত পরিধেয় পণ্য, সর্বত্র শিল্পছাপের বহমানতা লক্ষণীয়। তেমনি কয়েকটি কাজ হলো–

বিদ্রি ক্রাফট : রুপার ধাতুর ওপরে শৈল্পিক কারুকাজ করা। পরবর্তীতে এর ধাতুর মেল্টিং, কালারিং, অন্য ধাতুর মিশ্রণ যোগ করা হতো।

বানজারা নিডেল ক্রাফটস : বানজার আদিবাসীদের হাতে তৈরি করা কাপড়, এই কাপড়ের উপরে সুচারু নকশার মাধ্যমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণ সংযোজন করা হয়।

ডোকরা মেটাল ক্রাফটস : এটিও একটি আদিবাসীদের তৈরি ক্রাফট।

বিভিন্ন দেবদেবী, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর প্রভৃতি ক্রাফটের নকশা ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত সমৃদ্ধ।

নির্মল আর্টস : কাকাতিয়াদের সময় থেকে এই শিল্পের যাত্রা শুরু। প্রাকৃতিক রং ব্যবহার করে রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যগুলোর বিভিন্ন থিম চিত্রায়ণ করা হয়। এছাড়া কাঠের উপরেও এই শিল্পের চিত্রায়ণ করা হয়।

ব্রোঞ্জ ঢালাই : তামা ও টিন ধাতুর সংযোজনে কাদামাটির বিভিন্ন ছাঁচে ব্রোঞ্জ ঢালাই এর মাধ্যমে বিবিধ শিল্প তৈরি করা হয়।

ফোর্ট বা দুর্গ

ভঙ্গির ফোর্ট : ভঙ্গির ফোর্ট দশম শতকের দিকে চালুক্যের হাত ধরে প্রতিষ্ঠা পায়। এটি ৫০০ ফুট উপরে ৫০ একর ভূমি নিয়ে বিস্তৃত। দুর্গটিতে একটি হনুমান মন্দির ও পাহাড়ের উপরে অসংখ্য ছোট ছোট জলাধার রয়েছে।

দেবরাকোন্ডা ফোর্ট : তেরো থেকে চৌদ্দ শতকের দিকে নির্মিত হয়েছিল দেবরাকোন্ডা ফোর্ট। এর মধ্যে একটি শিব মন্দির ও জলাধার রয়েছে।

ডোমাকোন্ডা ফোর্ট : ডোমাকোন্ডা ফোর্টকে 'গাদি ডোমাকোন্ডা' বা 'কিল্লা ডোমাকান্ড'ও বলা হয়। এই দুর্গের ভেতরে একটি প্রাসাদ রয়েছে, যা 'অধলা মেদা' (কাচের ঘর) নামে পরিচিত। ডোমাকোন্ডার রাজপরিবার এখনো দুর্গটিকে প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে।

গোলকোন্ডা ফোর্ট : তিন বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত গোলকোন্ডা ফোর্ট। যার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪.৮ কিলোমিটার, উচ্চতায় প্রায় ১৩০ মিটার। এর ভেতরে একটি মসজিদ রয়েছে। এই দুর্গের একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে হাততালি দিলে তা প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়।

এছাড়াও অন্যান্য ফোর্টের মধ্যে রয়েছে এলগান্ডাল ফোর্ট, গাদওয়াল ফোর্ট, খাম্মাম ফোর্ট, মেদক ফোর্ট, নাগনুর ফোর্ট, নিজামবাদ ফোর্ট ইত্যাদি।

ভাষা

তেলেঙ্গানায় প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে বিবিধ জাতির শাসনামল-বসবাস থাকায়, মানুষের মধ্যে একধরনের সাম্প্রদায়িক মেলবন্ধন, অতিথিকে আপন করে নেওয়া, সামাজিক সম্প্রীতির বন্ধনে অন্যন্য উচ্চতা আসীন করেছে। রাজ্যের সরকারি ভাষা তেলেগু। অধিকাংশ জনগোষ্ঠী তেলেগু ভাষায় কথা বলে। এর পাশাপাশি হিন্দি, উর্দু, কন্নড়, মারাঠি ভাষারও মৃদু প্রচলন রয়েছে।

অর্থনীতি

তেলেঙ্গানার গ্রামীণ অর্থনীতি অত্যন্ত শক্তিশালী। গ্রামের তুলনায় শহরে মানুষের বসবাস কম। গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর জলকে সুপরিকল্পিতভাবে শুষ্ক মৌসুমে সেঁচ প্রকল্পের জন্য ব্যবহার করা হয়। যার জন্যে তেলেঙ্গানা ভারতবর্ষজুড়ে অধিক প্রশংসিত হয়েছে। রাজ্যের অর্থনীতিতে ধানের অবদান সর্বোচ্চ হলেও এর পাশাপাশি আখ, চালের আটা, ধানের তুষের তেল, রং, সাবান, কার্ডবোর্ড, প্যাকেজিং উপকরণ, গবাদি পশুর খাদ্য, মরিচ, ডাল (মটর, মটরশুটি এবং মসুর ডাল), রেড়ির মটরশুটি এবং চিনাবাদাম, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় ফল উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। এছাড়া বনভূমি থেকে প্রতি বছর সেগুন, ইউক্যালিপটাসের মতো উন্নতমানের কাঠ, সালের বীজ (ভোজ্য তেল), তেঁতুল পাতা (সিগারেটের রোলিং করার জন্য), বাঁশ সংগ্রহ করে বাণিজ্যিকভাবে রপ্তানি করা হয় এবং অব্যাহতভাবে এসব উপাদান নিশ্চিতকরণ ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রাজ্য সরকার প্রতিনিয়ত নতুন-নতুন বনায়ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

তেলেঙ্গানার প্রধান খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে কয়লা, চুনাপাথর, কোয়ার্টজ, গ্রানাইট, ফেল্ডস্পার, ডলোমাইট এবং ব্যারাইট। এছাড়া গোলকুন্ডা মালভূমির হীরার খনি যা একসময় 'কোহ-ই-নূর হীরা'-সহ মূল্যবান পাথর উৎপাদনের জন্য বিশ্বব্যাপী বিখ্যাত ছিল। বর্তমান ঐ খনি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে জেনারেটর, জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, সৌরশক্তি ব্যবহার করা হয়।

চলচ্চিত্র

তেলেগু সিনেমা টলিউড নামে পরিচিত। অন্ধ্রপ্রদেশ-তেলেঙ্গানা-ভারতবর্ষসহ এশিয়া অঞ্চলে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। বক্স অফিসের দিক থেকে ২০২১ সালে ভারতের সর্ববৃহৎ চলচ্চিত্রশিল্পে অবস্থান করে। তেলেগু সিনেমার অভিনয়-ডিরেকশন-সিনেমাটোগ্রাফি-লাইন প্রডিউসার-স্ক্রিপ্ট-মিউজিক কম্পোজিশন সিনেমা জগতে অন্যান্য। সিনেমায় ইতিহাস-জাতীয়তাবাদী-দেশপ্রেমের সাথে চলচ্চিত্রের নান্দনিক কলা-শৈল্পিক মনোভাবের সংমিশ্রণ ফুটিয়ে তুলতে খুবই অভিজ্ঞ তাদের সিনেমা শিল্প। এর উদাহরণ হিসেবে গুণশেখরের 'রুদ্রমা দেবী' উল্লেখযোগ্য। সম্প্রীতি সেরা মৌলিক গানের বিভাগে অস্কারে পুরস্কৃত হলো এসএস রাজামৌলীর মাস্টারবাস্টার মুভি আরআরআর-এর জনপ্রিয় গান 'নাটু নাটু'।

শান্ত জাবালি
শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

আপনার মতামত জানান
যোগাযোগের ঠিকানা ও ই-মেল
ফোন : ৫৫০৬৭৩০১-৮, ৫৫০৬৭৬৪৫-৯
এক্সটেনশন : ১১৪২
inf2.dhaka@mea.gov.in
ভারত বিচিত্রায় ব্যবহৃত বেশকিছু ছবি ও অলংকরণ ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।
ভারত বিচিত্রা বিক্রয়ের জন্য নয়

ভ্রমণ

ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কিংবদন্তির বারাণসী

কবীর হোসেন

বারাণসী নামটা শোনার সাথে সাথে যারা দিনদুনিয়ার একটু খোঁজখবর রাখেন তারা বলাবলি শুরু করল খুব সুন্দর জায়গা! গঙ্গাঘাটের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলো অনেকে। বলল, ভারতের সাংস্কৃতিক নগরী বারাণসী। খুবই সুন্দর। বহু প্রাচীন নগরী। কিন্তু সমস্যা হলো বারাণসীতে আমি যে কনফারেন্সে যাব সে আমন্ত্রণপত্রটি আসতে দেরি হচ্ছিল। এতকিছু শোনার পর ভ্রমণের আগ্রহটা আরও প্রসারিত হলো। শেষমেশ যাবার দুদিন আগে ভিসার কপিটি পেয়ে শংকামুক্ত হলাম। না, এবার যাওয়া হচ্ছে

সকাল সাড়ে ৭টার মধ্যে ঢাকার হজরত শাহজালাল বিমানবন্দরে পৌঁছালাম। সেখানে গিয়ে আমার অফিসের একজনসহ আরও চারজন বাঙালি কৃষিবিজ্ঞানীর সাথে মিলিত হলাম, যারা আমার সফরসঙ্গী ছিল। আমাদের ফ্লাইট ছিল সকাল ১০টা ১০-এ। আমরা দিল্লি এয়ারপোর্ট পৌঁছলাম সাড়ে ১২টার দিকে। আগেও ২০০৮ এ একবার গিয়েছিলাম। কিন্তু এবার এয়ারপোর্টের ভেতরে ঢুকে দেখলাম এলাহি কাণ্ড। যেন আমাদের এয়ারপোর্টের দশটির সমান। বেশ ক'বার বিশ্বের ভালো এয়ারপোর্টের মর্যাদাসিক্ত।

আমরা হাঁটতে লাগলাম ইমিগ্রেশনের উদ্দেশ্যে। হাঁটা কি, বলা যায় দৌড়! একটু পরপরই এসকেলেটর (চলন্ত) সিঁড়ি পথে পথে বিছানো। এটা আগে কখনো দেখিনি। সাধারণত বহুতল মার্কেটগুলোতে ওঠানামার জন্য এগুলোর ব্যবহার দেখেছি। এখানে পথগুলো দ্রুততর করতে ব্যবহৃত হচ্ছে। সিঁড়িতে উঠেও দাঁড়িয়ে থাকা নয়, সেখানে উঠেও হাঁটা। যেন আরও একটু দ্রুত হয়। এইভাবে বহু সিঁড়ি ও রাস্তা পেরিয়ে ইমিগ্রেশনে পৌঁছালাম।

এই বৃহৎ এয়ারপোর্টটিতে বাংলাদেশ থেকে আসা আমাদের একজন প্রতিনিধি আগেরদিন তাঁর প্রিয় ল্যাপটপটি ফেলে গেলেও বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে জানালে তা ফেরত পেয়েছেন। এমন এয়ারপোর্ট যেখানে মিনিটে মিনিটে নতুন ফ্লাইট ও নতুন মানুষ আসে সেখানে এরকম একটি জিনিস আমরা ফিরে পেয়ে বিস্মিত, একইসঙ্গে আনন্দিত। এ জন্যই দিল্লির এয়ারপোর্ট বিশ্বের আদর্শ এয়ারপোর্টের মর্যাদা পেয়েছে।

আমাদের পাঁচজনের দুজনের বারাণসীর ফ্লাইট ছিল দুটোয়। তাদের বিদায় জানিয়ে আমরা এয়ারপোর্টের বাইরে চলে এলাম। আমাদের বারাণসী যাবার ফ্লাইট ছ'টায়। আমরা ঠিক করলাম এই সময়টায় আমরা দিল্লির কুতুব মিনার দেখে আসব। এতে শহরের অংশ এবং জনজীবনের সাথেও পরিচয় হবে। তবে এটা ঠিক যে, স্থানীয় ভাষা না জানলে ভ্রমণ মোটামুটি মাটি হয়ে যায়। যদিও আমাদের একজন ভালো হিন্দি জানায় খুব একটা বেগ পেতে হয়নি।

এয়ারপোর্টের বাইরে আসামাত্র আমাদের ঘিরে ধরছিল একটার পর একটা ট্যাক্সি। কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে বিদেশি ফলে মানুষের আচার আচরণও লক্ষ করতে লাগলাম, শুধু ভাড়াই না। যাতে বিদেশে বসে বিপদে না পড়ি। পরে এক যুবকের গাড়িতে চেপে বসলাম। সব লাগেজ একটা গাড়িতে ধরছিল না। কিছুটা পায়ের ওপরে ধরে রাখতেও হয়েছে। পথে তুমুল ট্রাফিক জ্যাম ছিল ঢাকার মতো। দিল্লির দোকানপাট ও দালানকোঠার

সাথে ঢাকার কোনো পার্থক্য চোখে পড়ল না। কেবল সাইনবোর্ডগুলো বাংলার বদলে হিন্দিতে ছিল। মানুষগুলো তো একই বর্ণেরই।

আমরা বিদেশি হওয়ায় কুতুব মিনারে ঢোকার টিকেটের মূল্য বেশি ছিল। আমাদের দলের একজন খুব ভালো হিন্দি জানায় তার কথা শুনে আমাদের বিদেশি মনে করার কারণ ছিল না। আমরা বহুত, আচ্ছা ইত্যাদি বাংলা-হিন্দি কমন শব্দতেই সীমাবদ্ধ ছিলাম। আমরা লাগেজগুলো তাদের জিম্মায় রেখে কুতুব মিনারে ঢুকলাম। দেখলাম ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নারী-পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা আসছেন। ঘুরছেন। দেখছেন।

ইন্টারনেট ঘেঁটে পাওয়া তথ্যমতে, দিল্লির কুতুব মিনারের উচ্চতা ৭২.৫ মিটার। এই কুতুব মিনার ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যকীর্তির অন্যতম প্রাচীন নিদর্শন। এর আশপাশে আরও বেশ কিছু প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় স্থাপনা ও ধ্বংসাবশেষ রয়েছে, যা একত্রে কুতুব মিনার কমপ্লেক্স। এই কমপ্লেক্সটি ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব ঐতিহ্য স্থান হিসেবে তালিকাবদ্ধ হয়েছে এবং এটি দিল্লির অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটনকেন্দ্র। ২০০৬ সালের এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় তাজমহলের পর্যটন সংখ্যার চেয়ে ওই বছর কুতুব মিনারের পর্যটক সংখ্যা বেশি ছিল। ওই বছর কুতুব মিনারে পর্যটকের সংখ্যা ছিল ৩৮.৯৫ লাখ ও তাজমহলের পর্যটন সংখ্যা ছিল ২৫.৪ লাখ।

কুতুব মিনারে আমরা আমাদের একজন সঙ্গী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম। যেহেতু আমাদের কারো কাছে ভারতীয় মোবাইল সিম ছিল না। ফলে আমরা পরস্পরকে খুঁজতে খুঁজতে অনেক সময় অপচয় করে ফেলেছিলাম। বিমানবন্দরে পৌঁছানোর সময় নিয়েও সন্দিহান হয়ে পড়লাম। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল যে এবারে ড্রাইভার আমাদের অন্য রোড দিয়ে নিয়ে গেলেন। এতে সময় অনেক কম লাগল।

এবার আবার দিল্লির এয়ারপোর্টে ঢোকার জন্য চেকিং করছি বারণসীর উদ্দেশ্যে। বারাণসী স্থানটি বিশ্বনাথ মন্দিরের জন্য শুধু হিন্দুদের কাছেই নয়, বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম শিক্ষারও পীঠস্থান এটি। এখানে রয়েছে ২৩০০০ মন্দির। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, সংকট মোচন, হনুমান মন্দির ও দুর্গা মন্দির। এছাড়া বারাণসে রয়েছে ৫০ হাজার ব্রাহ্মণের বসবাস। কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। পর্যটকদের কাছে যা গঙ্গাঘাট হিসেবে পরিচিত। তথ্য মতে, ১৭৯১ সালে ব্রিটিশ গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ও জোনাথান ডানকান এই শহরে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৬৭ সালে গঠিত হয় বারাণসী মিউনিসিপ্যাল বোর্ড। ১৮৯৭ সালে বিশিষ্ট ভারতপ্রেমিক সাহিত্যিক মার্ক টোয়েন বারাণসী সম্পর্কে লেখেন, 'বারাণসী ইতিহাসের চেয়েও পুরনো, ঐতিহ্যের চেয়েও পুরনো, এমনকি কিংবদন্তির চেয়েও পুরনো।

লক্ষণীয়, এবার এমন কিছু সিনিয়র সিটিজেনকে দেখতে পেলাম যাদের দেখলে সহজেই অনুমান করা যায় যে তারা তীর্থযাত্রী। আমরা শৈশবে গ্রামে বসে শুনেছি যে শেষ জীবনে হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ পুণ্য অর্জনে সংসারের মায়া ত্যাগ করে কাশী চলে যায়। এবার তা প্রত্যক্ষ করলাম। নাটকেও দেখেছি তাদের অনেকে ইহজীবনের পাঠ শেষ করে কাশীর উদ্দেশে গমনের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

বারাণসীকে বলা হয় ভারতের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র। এখানে রবি শংকর, বিসমিল্লাহ্ খান, গিরিজা দেবী প্রমুখের বসবাস ছিল। এখানকার হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়টি এশিয়ার একটি নামকরা বিদ্যাপীঠ। এখানে প্রায় বিশ হাজার শিক্ষার্থী পড়ে। বারাণসীতে বসবাসকারী জনসংখ্যা খুব বেশি নয়। ২০১১ সালের যে তথ্য, তাতে বারাণাসী মহানগরের জনসংখ্যা ১,৪৩৫,১১৩। তবে শিক্ষিতের হার অনেক। ৮৪%। আড়াই হাজারের মতো মুসলিম ও ০.৯২% বাংলা ভাষায় কথা বলে। প্রায় ৮৫% হিন্দু ও হিন্দি ভাষাপ্রধান বারাণসী। প্রতিবছর দেশের বাইরে থেকে দুলাখের মতো পর্যটকের আনাগোনা ছাড়াও দেশের ভেতর থেকেও বছরে ৩ লাখের মতো পর্যটক থাকে এ অঞ্চলে। ফলে হোটেল মোটেল ও শপিং মলের সংখ্যাও কম নয়।

আমাদের ফ্লাইট ছিল সন্ধ্যায়। আমাদের কনফারেন্সে যোগ দিতে আসা অনেকেই এই ফ্ল্যাইটে ছিল। বারাণসী এয়ারপোর্টে নামার পর চোখে পড়ল জি-টোয়েন্টি সম্মেলনের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ব্যানার ও তাতে জলবায়ু নিয়ে তাঁর বাণী। দিল্লি থেকে বারাণসী যেতে প্লেনে সময় লাগে ১ ঘণ্টার মতো। দিল্লি থেকে ৮০০ কিলোমিটারের মতো দূরতম উত্তর প্রদেশের এই পুরানো শহর। এ এয়ারপোর্টটিও বিশ্বের নন্দিত এয়ারপোর্টের একটি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে, যা দেয়ালে লিখে রাখা হয়েছে। এটিও ঢাকার বিমানবন্দরের থেকে অনেক বড় হবে। দেখলাম, ভারতে হয়তো বাংলাদেশের রাজধানীর মতো ব্যক্তিগত উঁচু ভবন নেই কিন্তু তাদের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ঠিকই বড়।

এরপর এয়ারপোর্ট থেকে ছোট্ট একটি বাসে চরে আমরা বারাণসীতে আমাদের থাকবার হোটেল মেরেডিয়ানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। গাড়িটির পেছনে বসেছিলাম আমি। মাঝে মাঝেই চায়ের দোকান দেখে নেমে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু তার উপায় ছিল না। তাছাড়া ততক্ষণে ডলার ভেঙে রুপি বানানোও হয়নি। হোটেলে পৌঁছালাম ১০টার পরে। বেশ অভিজাত ও পুরানো হোটেল। হোটেলের খাবার দাবার একটু স্পাইসি ছিল। তবে তা আমাদের রুচি বাড়িয়ে দিয়েছিল।

আমরা পাঁচ দিন ছিলাম বারাণসীতে। প্রতিদিনই বাজারে গেছি, দোকানে গেছি। কখনো কখনো চা খেতে খুপরির ভেতরেও ঢুকেছি। সেলফির প্রয়োজনে নয়, চায়ের পিপাসায়ই। আমাদের দলের অনেকেই গঙ্গাঘাট দেখতে গেছেন। সবচেয়ে বড় কথা সবার মুখে মুখে ছিল বেনারসি শাড়ির প্রসঙ্গ। সম্ভবত এ কারণে বারাণাসকে কেউ কেউ বেনারাসও বলে। এখানকার বেনারসি শাড়ির কদর এ উপমহাদেশে ব্যাপক। খুব কম পর্যটকই পাওয়া যাবে যারা বারাণসী গিয়ে বেনারসি শাড়ি না কিনে ফিরবে। সবাই বলতেন, বেনারসি না নিয়ে ঢাকায় ফিরলে স্ত্রী বাসায় ঢুকতে দেবেন না। অমাদের কেউ কেউ লাখ/দেড়লাখ টাকার বাজারও করেছেন। সবার ক্ষেত্রেই বেনারসি ছিল মাস্ট। আমাকেও দুটি কিনতে হয়েছিল। •

কবীর হোসেন
কবি, যোগাযোগ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞ।

জন্মাষ্টমী

শ্রীকৃষ্ণ

বৈচিত্র্যপূর্ণ এক চরিত্রের আখ্যান

সুদেব চক্রবর্তী

ভারতীয় পুরাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব শ্রীকৃষ্ণের এই মর্ত্যধামে আবির্ভাবের কারণ স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় উল্লেখ করেছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শুরুতে শ্রীকৃষ্ণ তার পাণ্ডবসখা অর্জুনকে উপদেশ দেবার সময়ে বলেছিলেন–

'যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় হি সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

সনাতন হিন্দু ধর্মালম্বীদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাই কেবল এক পৌরাণিক চরিত্র নয়–বরং ভগবান, ঈশ্বরের মানবীয় প্রকাশ, অবতার। কিন্তু অন্যান্য ধর্মবেত্তাগণ থেকে শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ আলাদা হবার কারণ হলো শ্রীকৃষ্ণের বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র। কোথাও তিনি রাখাল বংশীবাদক, কোথাও তিনি প্রেমিক, কোথাও তিনি কূটনীতিক, রাজনীতিবিদ, যোদ্ধা, সারথি ও রাজা। এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্র খুব কমই দেখা যায়। তবে বিভিন্ন দেশে বা অঞ্চলে মিথলজির একটা বৈশিষ্ট্য হলো একটি অঞ্চলের চরিত্রের সাথে ভিন্ন অঞ্চলের আরেকটা চরিত্রের সাদৃশ্য থাকা

যেমন–গ্রিক পুরাণের জিউসের সাথে ভারতীয় পুরাণের ইন্দ্রের মিল রয়েছে। একইভাবে শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের সাথে আমরা মিল পাই মোজেসের। এই নিবন্ধে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রেক্ষাপট, শ্রীকৃষ্ণের ঐতিহাসিক প্রমাণ অনুসন্ধান এবং তার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ চরিত্রেরই নানা দিক পর্যালোচনা করবো।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের প্রাক্কালে মথুরার পরিস্থিতির দিকে নজর দেওয়া আবশ্যক। মথুরা শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি। বর্তমান দিল্লি থেকে মথুরার দূরত্ব ১৪৫ কিলোমিটার। মথুরার রাজা ছিলেন ভোজবংশীয় উগ্রসেন। উগ্রসেনের নয় পুত্র ও পাঁচ কন্যা, কংস তাদেরই একজন। কিন্তু কংসের জন্ম উগ্রসেনের ঔরসে নয়। পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে কংসের জন্মবৃত্তান্ত হলো–একদিন উগ্রসেনের স্ত্রী পদ্মাবতী স্নান শেষে ফেরার পথে দেখা হয় দ্রুমিল নামক এক অসুর বা দানবের সাথে। দ্রুমিল পদ্মাবতীকে দেখে কামার্ত হয়ে পড়ে এবং উগ্রসেনের রূপ ধরে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। সঙ্গম শেষে পদ্মাবতীর সন্দেহ হয় এবং দ্রুমিলের পরিচয় জানতে চান। এ সময় পদ্মাবতী 'কংস ত্বং' শব্দটি উচ্চারণ করেছিলেন। দ্রুমিল তখন তার সত্য পরিচয় জানায় এবং এই ধরনের সঙ্গম কোনো পাপ নয় এমনটি জানায়। দ্রুমিলের যুক্তি ছিল নারীরা সেযুগে চাইলে এরকম সঙ্গমের মাধ্যমে দেবতার ন্যায় সন্তান উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু পদ্মাবতী ক্ষোভে ফেটে পড়েন এবং দ্রুমিলকে তিরস্কার করতে থাকেন। দ্রুমিল চলে যাবার আগে জানিয়ে যায় পদ্মাবতী যেহেতু 'কংস ত্বং' শব্দটি উচ্চারণ করেছেন, সেজন্য কংস নামে তার একটি পুত্র জন্মাবে। এই কাহিনি থেকে কংসের দানবীয় আচরণের নেপথ্য কারণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এবার আসা যাক কংসের প্রিয় ভগ্নি শ্রীকৃষ্ণের জননী দেবকীর প্রসঙ্গে। দেবকী কংসের আপন ভগ্নি নয়। রাজা উগ্রসেনের ভ্রাতা দেবকের কন্যা হলো দেবকী। কাকাতো বোন হলেও দেবকী ছিল কংসের প্রিয়। ফলে কংসের আপন বোন কংসার চাইতেও দেবকীকে সে বেশি স্নেহ করত।

কংস বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তার ভেতর আসুরিক চিন্তা ও দানবীয় আচরণ প্রকাশ পেতে লাগল। কংসকে উগ্রসেন খুব বেশি একটা পছন্দ করতেন না। একবার কংস এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে, ফলে রাজসভার বিচারে তার কারাদণ্ড হয়। কারাগার থেকে বেরিয়ে কংস উগ্রসেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করে নেয়। এই কাজে তাকে সহায়তা করে মগধের রাজা জরাসন্ধ। কংস ছিল জরাসন্ধের জামাতা। জরাসন্ধের দুই কন্যা অস্তি এবং প্রাপ্তিকে কংস বিবাহ করেছিল। মগধ প্রসঙ্গে একটা তথ্য উল্লেখ করতে চাই, মগধ বরাবরই শক্তিশালী জনপদ হিসেবে পরিচিত।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের এক হাজার বছরের কিছুটা বেশি সময় পর আলেকজান্ডারের নেতৃত্বে গ্রিকরা যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করে তখন তাদেরকে প্রতিহত করতে মগধই ছিল সক্ষম রাষ্ট্র। এজন্যই আমরা দেখি অখণ্ড ভারতের স্বপ্নদ্রষ্টা আচার্য চাণক্য তক্ষশিলা থেকে ছুটে গিয়েছিলেন মগধরাজ ধনানন্দের কাছে। কিন্তু মদ্যপ এবং ভোগবিলাসে মত্ত ধনানন্দ চাণক্যকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে চাণক্য প্রতিজ্ঞা করেন ধনানন্দকে উৎখাতের। এরই প্রেক্ষিতে চাণক্য তার শিষ্য চন্দ্রগুপ্তকে তৈরি করেন এবং চন্দ্রগুপ্তের নেতৃত্বে মগধের সিংহাসন দখল করেন। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প্রসঙ্গ এখানে আনার উদ্দেশ্য হলো বঙ্কিমচন্দ্র তার 'কৃষ্ণ চরিত্র' গ্রন্থে জানাচ্ছেন চন্দ্রগুপ্ত থেকে যুধিষ্ঠিরের শাসনকাল ১১১৫ বছর আগে এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ প্রসঙ্গে ড. অমূল্য বিকাশ বসাক তার 'বিজ্ঞানের আলোকে শ্রীমদ্ভগবদগীতা' গ্রন্থে জানাচ্ছেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণ ও অর্জুনের বয়স ছিল ৭০ বছর। আজকের দিনে ৭০ বছর বার্ধক্যের কোটায় ধরা হলেও সেই যুগে অর্থাৎ দ্বাপরযুগে যখন মানুষের আয়ুষ্কাল ২০০ বছর, তখন ৭০ বছরকে নিশ্চয়ই বার্ধক্য হিসেবে ধরা হতো না। এর ফলে বলা যায় মহাভারতের ঐতিহাসিকতার প্রশ্ন কিছুটা সুরাহা হয়। এই মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ সবচেয়ে রহস্যপূর্ণ চরিত্র। এখানে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের অনেক সমালোচনাও করা সম্ভব। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে নেতিবাচক যা কিছু পেয়েছেন তা প্রক্ষেপ বলে বাতিল করে দিয়েছেন। কিন্তু মহাভারতে আমরা যে শ্রীকৃষ্ণকে দেখি সেই শ্রীকৃষ্ণ একজন দক্ষ কূটনীতিক। তিনিও যেন দক্ষতার সাথে প্রয়োগ করছেন সাম-দাম-দণ্ড-ভেদ যা আমরা শ্রীকৃষ্ণ পরবর্তী এক হাজার বছর পর চাণক্যের মধ্যে দেখি। এ প্রসঙ্গে বলি–যীশুখ্রিষ্টের জন্মের প্রায় ৫০০ বছর আগে চীনের রাজ্যের সেনাপতি ছিলেন সান জু। তিনি ছিলেন মহাবীর। তিনি একটি গ্রন্থ লিখেছিলেন–The Art Of War. এই গ্রন্থে তিনি লিখেছিলেন–All warfare is based on deception. মহাভারতে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে দেখি সান জু–এর বহু আগে এই বাক্যের সফল প্রয়োগ ঘটাতে। তবে আমাদের ভুলে গেলে চলবে না মহাভারতে পরবর্তীতে বহু ঘটনা, কিংবদন্তি ঢুকেছে। বহুজন এখানে হস্তক্ষেপ করেছেন। রাজশেখর বসু 'মহাভারত' এর অনুবাদ করতে গিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন–'সকল দেশেই কুম্ভীলভ বা Plagiarist আছেন যারা পরের রচনা চুরি করে নিজের নামে চালান। কিন্তু ভারতবর্ষে কুম্ভীলকের বিপরীতই বেশি দেখা যায়। এরা কবিযশঃপ্রার্থী নন, বিখ্যাত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে নিজের রচনা গুঁজে দিয়েই কৃতার্থ হন।' এভাবে মহাভারতে বহু ঘটনা প্রক্ষেপ হয়েছে, যা থেকে কৃষ্ণ চরিত্রও বাদ পড়েনি।

যাহোক, মথুরায় শাসনক্ষমতা দখলের পর কংস দিনে দিনে অত্যাচারী হয়ে ওঠে। মথুরার জনগণের মাঝে ক্ষোভ বাড়তে থাকে। বিশেষ করে যাদবরা কংসের প্রতি বিরূপ হতে থাকে। যাদবরা কখনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। ফলে যাদবদের নিয়ে কংসের চিন্তা ছিল। কৌশলী কংস তার সৈন্যবাহিনী আর দেহরক্ষী ছাড়া কোথাও তেমন পরিবর্তন করেনি। সেনাপতি প্রদ্যোৎ আর প্রলম্বকে গণনায়ক হিসেবে বহাল রেখেছিল। কিন্তু মূল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত মগধের চানুর। কেননা মগধের সহায়তায় অভ্যুত্থান ঘটানোয় মগধের নিয়ন্ত্রণ টিকে রইল মথুরার ওপর। তবে কংসের সামনে একটা সুযোগ চলে এলো যাদবদের সাথে সম্পর্ক শীতল করার। সেটি হলো তার খুল্লতাত বোন দেবকীর বিবাহ। এ উপলক্ষে আয়োজন করা হলো স্বয়ংবরা অনুষ্ঠানের। দেবকী যাদবদের বৃষ্ণি গোষ্ঠীর বসুদেবকে পছন্দ করেন এবং তাকে পতিরূপে স্বীকার করেন। উগ্রসেন বা কংস কুকুরা গোত্রের বা ভোজ বংশের হলেও মথুরা রাজ্যে বৃষ্ণিদের প্রভাব ছিল। এর কারণ মথুরাকে গণরাজ্য হিসেবে তৈরি করতে তাদের ভূমিকা ছিল। ফলে মথুরা রাজ্যকে লোকে বৃষ্ণি রাজ্য নামেও ডাকত। বসুদেব অবশ্য বিবাহিত ছিল। দেবকীর পূর্ববর্তী ছয় বোনকে তিনি বিবাহ করেছিলেন। বসুদেবের বাবা শূরসেন ছিলেন মথুরার একজন প্রভাবশালী, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। এই পরিচয় বসুদেবকেও সমাজে প্রভাব বিস্তারে ভূমিকা রাখে। বসুদেবের পিতা শূরসেন ছিলেন যাদব তথা যদু বংশের ৩১তম বংশধর। এই যদু বংশের নামকরণ হয় চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতি নহুষের পাঁচজন পুত্রের একজন–যদুর নামানুসারে। যাহোক, বসুদেব তখন মথুরার বহু নারীর হৃদয়ে আকাঙ্ক্ষিত। দেবকীও তাই একাধিক পত্নী থাকা সত্ত্বেও, যারা আবার তারই জ্যেষ্ঠ বোন, সেই বসুদেবকেই কামনা করলেন। এমনকি এক সময়ে উগ্রসেনও চেয়েছিলেন বসুদেবের সাথে তার কন্যার বিবাহ দিতে। কিন্তু ভাই দেবকের ছয়জন কন্যার সাথে বিবাহ হয়েছে বলে এ বিষয়ে তিনি এগোননি। বসুদেব প্রথমে এই বিবাহে

কংস বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথেই তার ভেতর আসুরিক চিন্তা ও দানবীয় আচরণ প্রকাশ পেতে লাগল। কংসকে উগ্রসেন খুব বেশি একটা পছন্দ করতেন না। একবার কংস এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করে, ফলে রাজসভার বিচারে তার কারাদণ্ড হয়। কারাগার থেকে বেরিয়ে কংস উগ্রসেনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিংহাসন দখল করে নেয়

সম্মত হননি। কিন্তু মথুরার রাজপুরোহিত গর্গাচর্য বসুদেবকে রাজি করান।

কারণ গর্গাচর্য একজন জ্যোতিষী ছিলেন। তিনি গণনার মাধ্যমে জেনেছিলেন বসুদেব আর দেবকীর অষ্টম সন্তান কংস বধের কারণ হবে। যেহেতু গর্গাচর্যসহ অনেকেই কংসের শাসনে বিরক্ত ছিলেন এবং কংসের বিনাশ চাইছিলেন তাই গর্গাচর্য বসুদেবকে এই বিবাহে রাজি করান।

এই বিবাহে কংস বেশ খুশিই হলো। তাছাড়া দেবকী তার প্রিয় ভগ্নি। ফলে বিবাহের পর নিজে রথের সারথি হয়ে নবদম্পতিকে নিয়ে যাচ্ছিলেন। এই সময়েই সেই দৈববাণীর ঘটনা ঘটে। আমরা এতক্ষণে বলা ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি ব্যাপারটা ঠিক ওই অর্থে দৈববাণী ছিল না। বরং গর্গাচর্যই কোনো মাধ্যমে কংসকে জানিয়ে দিয়েছিলেন তার ভবিতব্য। তার পরের ঘটনাবলি আমরা জানি। বসুদেব-দেবকীর কারাবরণ, কংস কর্তৃক ধারাবাহিক শিশু হত্যা, কৃষ্ণের জন্ম, নন্দালয়ে যশোধার নিকট কৃষ্ণের বেড়ে ওঠা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কংস হত্যা। কংস হত্যার পর শ্রীকৃষ্ণ উগ্রসেনকে কারামুক্ত করে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। এরপর শ্রীকৃষ্ণ ও তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলরাম চলে যান সান্দীপনি ঋষির নিকট বিদ্যাশিক্ষা লাভের জন্য। এরপর একে একে বহু অপশক্তি বিনাশে শ্রীকৃষ্ণ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রায় সরাসরি অংশ নিয়েছিলেন ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য। সুতরাং গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৭ম ও ৮ম শ্লোকে তিনি যা বলেছিলেন সেটাই তার আবির্ভাবের কারণ হিসেবে পরিগণিত। ভক্তদের নিকট তিনি অবতার। যুগে যুগে আবির্ভূত হন। কোথাও তিনি রাম, কোথাও তিনি নৃসিংহ। আর দ্বাপরে তিনি কৃষ্ণ। কিন্তু একই সময়ে বলরাম এবং কৃষ্ণ দুজনই বিষ্ণুর অবতার কীরূপে তা একটি জটিল বিষয়ই বটে।

কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মুহূর্তটি ছিল ভাদ্র মাসের রোহিনী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথি। এটাই জন্মাষ্টমী বা কৃষ্ণাষ্টমী নামে পরিচিত। প্রতিবছর ভাদ্র মাসের এই তিথিতে সাড়ম্বরে জন্মাষ্টমী পালিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় নিয়ে নানা গবেষণা চলেছে। কোনো কোনো গবেষক বলছেন পাঁচ হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে। আর একশ পঁচিশ বছর লীলা শেষে তিনি অপ্রকট হন বা মহানির্বাণ লাভ করেন মাঘীপূর্ণিমা তিথিতে।

এ পর্যায়ে আমরা বেদের দিকে নজর দিতে চাই। যেহেতু বেদকে বলা হয়েছে হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বেদে প্রাচীন ভারতবর্ষের কিছু সূত্র পাওয়া যায় যা দ্বারা নৃতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা সম্ভব। কেননা সেখানে প্রাচীন ভারতীয়রা বিশেষ করে বেদ প্রণেতা আর্যদের জীবনযাপন, রীতিনীতির বর্ণনা রয়েছে।

ঋকবেদে বেশ কয়েকবার কৃষ্ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। কোথাও তাকে ইন্দ্রবিরোধী অনার্য যোদ্ধা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কিন্তু বেদে উল্লেখিত কৃষ্ণ, মহাভারতের কৃষ্ণ এবং বৈষ্ণব পদাবলির কৃষ্ণ একই চরিত্র কিনা কিংবা এদের কতটুকু অংশ প্রক্ষেপ তা অনুসন্ধানযোগ্য। তবু যেন কোথাও একটা সূত্র রয়েছে। বেদবিষয়ক আলোচনায় প্রশ্ন এসে যায় শ্রীকৃষ্ণ কি বেদবিরোধী ছিলেন? এ বিষয়ে আমরা একটু পরে আলোকপাত করব। গীতাতেই এর একটা উত্তর রয়েছে যেটা কেউ সামনে আনতে সাহস করেননি। যাহোক, ঋকবেদে দেবতা বরুণের ঘনিষ্ঠ যে দেবতা সে হলো মিত্র। আবেস্তাতেও মিত্র বা মিথকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। মহাভারতে বরুণের নাম পাল্টে ধর্ম করা হয়েছে। একই কারণে মিত্রের নামকরণ হয়েছে কৃষ্ণ। হরপ্পা সভ্যতার ওপর গবেষণার প্রেক্ষিতে এমনটা জানাচ্ছেন গবেষক শামসুজ্জোহা মানিক এবং শামসুল আলম চঞ্চল তাদের 'আর্যজন ও সিন্ধু সভ্যতা' নামক গ্রন্থে। তার মানে তাদের মতো মেনে নিলে বিষয়টা দাঁড়ায় এই ঋকবেদের মিত্র আর মহাভারতের কৃষ্ণ একই। এখানে আরেকটা বিষয় অনুমান করা যেতে পারে। মিত্রের অপর নাম কৃষ্ণ এবং তার গায়ের রং কালো ছিল। আবার মহাভারতের রচয়িতা ও বেদ বিভাজনকারী বেদব্যাসের প্রকৃত নাম ছিল দ্বৈপায়ন। যমুনা নদীর দ্বীপে জন্ম হয়েছিল বলে তার এই নাম। তার গায়ের রং অসিত হওয়ায় তাকে কৃষ্ণ দ্বৈপায়নও বলা হয়। এখন প্রশ্ন হলো–মিত্র, কৃষ্ণ ও দ্বৈপায়ন কি একজনেরই নাম? মানে কৃষ্ণ নামটা কি দ্বৈপায়নের দেয়া? এটা আপাতত অনুমান হিসেবেই ধরে নেয়া যাক।

এদিকে সমুদ্র তলদেশে দ্বারকার সন্ধান পাওয়া গেছে। এখন সেখানে হয়তো কোনো রাজা ছিল যার নাম কৃষ্ণ হিসেবে স্বয়ং দ্বৈপায়ন মহাভারতে উপস্থাপন করেছিলেন।

আবার কেউ কেউ কৃষ্ণকে অনার্যদের উপাস্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। পরে তাকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের সাথে যুক্ত করা হয় এবং পরবর্তীতে কৃষ্ণ নাম কেন্দ্র করে বৈষ্ণবধর্ম সংগঠিত হয়। কৃষ্ণ কেবল অনার্যদের উপাস্য ছিলেন–এমন বাক্য পুরোপুরি সত্য না হলেও এটা আমরা জানি জন্মাষ্টমী মূলত ব্রত হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। বাংলা, যেটাকে অনার্যভূমি বলা হয়, সেখানেও বহু আগে থেকে জন্মাষ্টমী পালিত হয়ে আসছে। আর বাংলার বিখ্যাত জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রা শুরু হয়েছে ১৫৬৫ সালে ঢাকার বংশাল এলাকায়। যদিও ১৫৫৫ সালে একটি র‍্যালি বের করা হয়েছিল, কিন্তু সেটা ছিল রাধাষ্টমী উপলক্ষে। এই র‍্যালিই ১০ বছর পর জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় পরিণত হয়। যাহোক, অনার্য বা ব্রাত্য যারা তাদের আচারকেই ব্রত বলা হয়ে থাকে। বিশেষ করে বাংলায় যত লৌকিক দেবতা তাদের সবাই এই ব্রাত্যদের উপাস্য। পরবর্তীতে এসব দেবতাদের অনেকেরই আর্যিকরণ ঘটেছে। যেমন–মনসা, শীতলা, কালী প্রভৃতি। বৈদিক সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণকে অনার্য যোদ্ধা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেই বিবেচনায় আমরা এমনটা ধরে নিতে পারি শ্রীকৃষ্ণেরও প্রথমে আর্যিকরণ, তারও বহু পরে বৈষ্ণবায়ণ করা হয়েছে।

কংসের কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মের মুহূর্তটি ছিল ভাদ্র মাসের রোহিনী নক্ষত্রযুক্ত অষ্টমী তিথি। এটাই জন্মাষ্টমী বা কৃষ্ণাষ্টমী নামে পরিচিত। প্রতিবছর ভাদ্র মাসের এই তিথিতে সাড়ম্বরে জন্মাষ্টমী পালিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবের সময় নিয়ে নানা গবেষণা চলেছে। কোনো কোনো গবেষক বলছেন পাঁচ হাজার দুশো পঁয়তাল্লিশ বছর আগে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঘটে

দ্বাপর যুগের অবতার শ্রীকৃষ্ণ বর্তমান কলিযুগে খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর কারণ চৈতন্যদেব স্বয়ং। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে প্রেমের অবতার হিসেবে তুলে এনে ভাবান্দোলন শুরু করেন যার লক্ষ্য ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের কবল থেকে হিন্দুদের মুক্তি দিয়ে সাম্য আনয়ন করা। কিন্তু বৈষ্ণবদেরকে বৈদিকরা প্রত্যাখ্যান করছে–এমন উদাহরণও রয়েছে। বেদই হিন্দুদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ। বঙ্কিমচন্দ্র এই জটিলতায় পড়েছিলেন। পরে বেদান্তবাদীদের চাপে বেদের পক্ষে গীতার শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। এরকম আরও উদাহরণ আছে। কপিল ঈশ্বর ত্যাগ করেছিলেন কিন্তু বেদ ত্যাগ করতে পারেননি।

শ্রীমদভগবদগীতার সাংখ্যযোগে শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপ্রহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়িত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥'

এখানে শ্রীকৃষ্ণ বলতে চাইছেন বেদের কর্ম কেবল ভোগ বাড়ায়। এসব

কর্ম মুক্তির জন্য বাধা। এগুলোতে যারা আসক্ত তাদের চিত্ত কলুষিত। বিষয়টা খোলাসা করা যাক–বেদের ভাগ হলো চারটি : সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক এবং উপনিষদ। এর মধ্যে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নিয়ে কর্মকাণ্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে জ্ঞানকাণ্ড। কর্মকাণ্ডে বিভিন্ন যাগযজ্ঞাদির ব্যবস্থা রয়েছে এবং বলা হয়েছে এইসব কর্মের ফলে স্বর্গ লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণ এই কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেছেন এবং এইসব কর্মের বিপরীতে অবস্থান নিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ মূলত গীতায় কর্ম, জ্ঞান আর ভক্তির অপূর্ব সমন্বয় দেখিয়েছেন। সেখানে আর্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত বর্ণপ্রথা যেটি বেদ জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়েছে বলে ঘোষণা দিয়েছে, তার বিপরীতে শ্রীকৃষ্ণ বর্ণপ্রথার দায় কৌশলে নিজের ওপর নিয়ে তিনি এটাকে কর্মানুযায়ী ব্যাখ্যা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রিক আরেকটি অধ্যায় হলো রাধাকৃষ্ণ উপাখ্যান। এই উপাখ্যান নিয়ে মতভেদ আছে। বাঙালি মননে এই উপাখ্যান বেশ পোক্ত হয়ে আছে। এখানে কৃষ্ণ চরিত্র একদম সহজ ও সরল। বাঙালির কাছে কৃষ্ণ কানু, কেষ্ট যাকে 'দুষ্টু', 'ননীচোরা', 'হারামজাদা' কত বিশেষণে বিশেষায়িত। প্রকৃতপক্ষে রাধা কৃষ্ণের ব্যাপারটা বৈষ্ণব কবিদের চিত্রায়ণ। কারণ বৈষ্ণব দর্শন মতে, কৃষ্ণ হলো পুরুষ এবং রাধা হলো প্রকৃতি। জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রতীক। সৃষ্টি বরাবরই স্রষ্টার সাথে মিলিত হতে ব্যাকুল, যেখানে ঈশ্বরের সাথে ভক্তের সম্পর্ক প্রভু-দাস নয়; বরং প্রেমের। এখানে হয়তো বৈষ্ণব কবিরা সৃষ্টিকে নারী প্রতীকে উপস্থাপন করেছেন। ফলে দেখা যায় কৃষ্ণের লীলাগুলোর আড়ালে গভীর তাৎপর্য রয়েছে। বৈষ্ণব কবিরা রূপকের আড়ালে এক গভীর তত্ত্ব বুঝিয়েছেন। বৈষ্ণব দর্শন মতে প্রেম কী? কত প্রকার? প্রেমের স্বরূপ–এসব না জানলে এই বিষয়টা অনুধাবন করা কঠিন কিংবা এই উপাখ্যানের রস আস্বাদন করা যাবে না। অপরদিকে শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রিক যতগুলো বিতর্ক রয়েছে তার মধ্যে একটি হলো তার স্ত্রীর সংখ্যা নিয়ে। হরিবংশ, বিভিন্ন পুরাণ এমনকি মহাভারতেও উল্লেখ আছে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রীর সংখ্যা ১৬ হাজার! কেউ বলছেন এই সংখ্যাটা ১৬ হাজার ১০৮ জন। কিন্তু এসব গ্রন্থ পর্যালোচনা করে দেখা গেল আমরা মোটামুটি শ্রীকৃষ্ণের ৮ জন স্ত্রীর নাম পাচ্ছি। রুক্মীনি, সত্যভামা অন্যতম নাম। কিন্তু বাকি ১৬ হাজার ১০০ জন কোথায়? এর উত্তর আমরা পাচ্ছি ভাগবত পুরাণে। সেখানে উল্লেখ রয়েছে–প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজা নরকাসুর খুব অত্যাচারী ছিলেন। তিনি তার হেরেমে ১৬ হাজার নারীকে বন্দি রেখেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ এবং সত্যভামা নরকাসুরের রাজ্য আক্রমণ করেন। আমরা জানি, কৃষ্ণের একটি নাম হলো–মুরারী। মূলত এই নরকাসুরের সেনাপতি মুরাসুরকে বধ করার পর তিনি মুরারী নামে পরিচিত হন। সুদর্শন চক্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করেন এবং সিংহাসনে নরকাসুরের পুত্র ভগদত্তকে অভিষিক্ত করেন। তারপর অপহৃত সেই ১৬ হাজার নারীকে মুক্ত করেন। কিন্তু ওই নারীরা, যারা একজন রাজার হেরেমে বন্দি ছিল, সমাজে তাদের জন্য বিব্রতকর পরিস্থিতি অপেক্ষা করছিল। তাই শ্রীকৃষ্ণ ওই ১৬ হাজার নারীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে সমাজে স্বীকৃতি দিলেন। এই ঘটনা কেন্দ্র করেই অনেক অতিরঞ্জন হয়েছে, প্রক্ষেপ হয়েছে। ভারতের উত্তর গুয়াহাটীতে অশ্বক্রান্ত নামে একটি মন্দির রয়েছে। ধারণা করা হয় নরকাসুরকে আক্রমণ করার আগে শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিশ্রাম নিয়েছিলেন।

কৃষ্ণ ভগবান। মহাভারতে আমরা দেখি তিনি বিশ্বরূপ দর্শন করাচ্ছেন। এটা অর্জুনসহ আমরা সবাই মেনে নিয়েছি। আবার দুর্যোধন এগুলোকে নিছক মায়াবিদ্যা বলে আখ্যা দিয়েছে। যা তখনকার বহু কৃষ্ণবিদ্বেষীরাও মনে করত। কিন্তু তিনি পুরুষোত্তম তা সর্বত্র স্বীকৃত। আর যেহেতু তাকে অবতার বলা হচ্ছে (যদিও বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে কৃষ্ণের নাম নেই) তাই তিনি জন্ম নিয়েছেন মানুষ হিসেবে, সুতরাং পুরাণ মতে তার মৃত্যুটাও স্বাভাবিক ছিল। কেননা, তিনিই বলেছিলেন–'জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। তস্মাদপরিহার্যেহর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥' গবেষক শামসুজ্জোহা মানিকের মতে, সব ধর্মই কম বেশি দ্বৈত পূজারি। ভক্তের দুই ঈশ্বর। এক ঈশ্বর অজানা ও অমূর্ত কল্পনার প্রতীক, অপরজন দেখা ও মূর্ত অবতার। গীতায় কৃষ্ণের অবতার রূপ স্পষ্ট। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের মানবিক প্রকাশ বলেছেন।

সুতরাং কৃষ্ণ চরিত্রের ঐতিহাসিকতা নিয়ে যত আলোচনাই হোক

কিংবা তার নাম যাই হোক- মানুষ এই নামকে ভক্তিভরে গ্রহণ করেই এগোতে চাইছে। শ্রীকৃষ্ণকে কেবল একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। শ্রীকৃষ্ণ যতটা না ইতিহাসের বিষয়, তারচেয়ে অধিক পৌরাণিক বিষয়। কিন্তু ভারতবর্ষে পুরাণ কেন্দ্র করে নৃতাত্ত্বিক কাজ তেমন একটা হয়নি। আবার পুরাণের বিষয়গুলো সাহিত্য হিসেবে যতটা না দেখা হয়েছে, তারচেয়ে বেশি ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 'ইলিয়াড' এবং 'রামায়ণ' বা 'মহাভারতে'র পার্থক্য এখানেই। যাহোক, শ্রীকৃষ্ণের মতো রহস্যপূর্ণ চরিত্রের বিষয়ে মতভেদ দূর হবার সুযোগ নেই। শ্রীকৃষ্ণ কেন্দ্রিক দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত যে বিশ্বাস সেটি টিকে থাকবে আরও বহু বহু বছর–এতে সন্দেহ নেই। বিশেষ করে এই কলি যুগে যখন শ্রীকৃষ্ণই প্রধান উপাস্য। এ কারণেই শ্রীকৃষ্ণ এবং তার দর্শন গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থসহায়িকা

১. কৃষ্ণচরিত্র-বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
২. আর্যজন ও সিন্ধুসভ্যতা- শামসুজ্জোহা মানিক ও শামসুল আলম চঞ্চল।
৩. মহাভারত- রাজশেখর বসু অনূদিত।
৪. শ্রীশ্রী গীতা- শ্রী জগদীশ চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত।
৫. বিজ্ঞানের আলোকে শ্রীমদভগবদগীতা- ড. অমূল্য বিকাশ বসাক।

সুদেব চক্রবর্তী
প্রাবন্ধিক

স্নেহময়ী মাদার তেরেসা

সুরুয খান

দরিদ্র, অবহেলিত ও আর্তজনের পরিত্রাতা হিসেবে উচ্চারিত একটি নাম–যাঁর অন্তরে মাতৃত্বের স্নেহ তিনি মাদার তেরেসা। মাদার তেরেসা এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি দুস্থ, অসহায়, অনাথ ও জরাব্যাধিগ্রস্ত শিশুকে মানবিক মর্যাদা দিয়েছেন। ১৯৬৮ সালে মাদার এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'গত ২০ বছর ধরে আমি বিপন্ন মানুষের মধ্যে কাজ করে বুঝেছি যে, তারা কতোখানি অবহেলিত আর উপেক্ষিত। অবহেলা আর উপেক্ষার মতো বড় বেদনা আর কিছুই নেই। সব ব্যাধিরই ওষুধ আছে। রোগ-ব্যাধি আছে, কিন্তু যারা অবহেলিত–হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসা দিয়ে যদি তাদের কাছে টেনে না নেওয়া যায় তবে কোনো ওষুধই তাদের ব্যাধি নির্মূল করতে পারবে না।' মাদার তেরেসার এই মানবসেবা একদিকে যেমন তাঁকে অনেক সম্মান, স্বীকৃতি ও পুরস্কার এনে দিয়েছে তেমনি অন্যদিকে হতভাগা, রুগ্ন, মুমূর্ষু থেকে শুরু করে রাজা, রাজমহিষী, রাষ্ট্রপ্রধান সকলেরই সম্মান আদায় করে নিয়েছিলেন।

মাদার তেরেসা ১৯১০ সালের ২৬ আগস্ট সাবেক যুগোস্লাভিয়ার স্কোপিয়েতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে যান এবং লরেটার একজন সন্ন্যাসিনী হন। পরের বছর চলে আসেন ভারতে। শিক্ষকতা শুরু করেন কলকাতার 'সেন্ট মেরী হাই স্কুলে।' ১৯৪৮ সালে মাদার ভারতীয় নাগরিকত্ব পান এবং সেখানেই দরিদ্রদের সেবা করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৯ সালে কলকাতার একটি বস্তিতে প্রথম স্কুল খোলেন। পরে তিনি ফিপ্ট লেনে মাইকেল গোমেজের বাড়িতে থেকে পরবর্তী কাজ শুরু করেন। ১৯৫০ সালের ৭ অক্টোবর কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করলেন 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটি'। শতাধিক দেশে এই সংস্থার শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে রয়েছে। ১৯৫২ সালের ২২ আগস্ট মাদার তেরেসা দক্ষিণ কলকাতার কালীঘাটে মুমূর্ষু অবহেলিতদের জন্য 'নির্মল হৃদয়' নামে একটি হোম চালু করেন। তাঁর হাতে প্রতিষ্ঠিত এটি দুস্থদের জন্য প্রথম আবাস। বহু মুমূর্ষু মানুষ এখানে আশ্রয় পেয়েছেন। এরপর দ্বিতীয় আবাসটি করলেন অনাথ শিশুদের জন্য 'নির্মলা শিশু ভবন'। অকৃত্রিম ভালোবাসা আর পারিবারিক বন্ধনের পরিবেশেই তাদের গড়ে তোলা হয়েছে এই ভবনে। এমনকি আগ্রহী সন্তানের দম্পতিরা তাদের কোল ভরে নিতে পারে এখানকার অনাথ শিশুকে গ্রহণের মাধ্যমে। ১৯৫৬ সালে চালু করেন 'মোবাইল ক্লিনিক'। তখনকার সময় কুষ্ঠরোগকে অভিশাপ হিসেবে ধরে নেওয়া হতো। এই হতভাগাদের সুস্থ করতে, মানুষের মতো বাঁচার সুযোগ করে দিতে মাদার ১৯৫৭ সালে গড়ে তুললেন 'গান্ধী প্রেম নিবাস।' মাদার আরও করেছিলেন অবহেলিত পূর্ব কলকাতায় 'প্রেম দান' নামে একটি আবাস। এইডস রোগীদের নিয়েও তিনি কম উদ্বিগ্ন ছিলেন না। গৌহাটিতে এইডস রোগীদের জন্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন। কলকাতার হাইকোর্টের নির্দেশে ৫০ জন নিরপরাধ মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলাকে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হলো ১৯৯৩ সালের ১০ অক্টোবর। এসব ভারসাম্যহীন অসহায়কে আশ্রয় দেওয়ার জন্য গড়ে তুললেন 'শান্তিদান'। এভাবে মানবকল্যাণে তাঁর কাজের উন্মাদনা এবং ইচ্ছাশক্তি জয় লাভ করেছে বারবার। সারা বিশ্ব তাই তাঁকে এই মানবসেবার স্বীকৃতি ও সম্মান জানিয়েছে অনেকবার। ১৯৭৯ সালের ১০ ডিসেম্বর মাদার পেলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান 'নোবেল শান্তি পুরস্কার।' এই পুরস্কারের যাবতীয় অর্থ তিনি দান করেছিলেন আর্তের সেবায়। এছাড়া ১৯৬২ সালে ভারত সরকার থেকে 'পদ্মশ্রী' ও ফিলিপিন্স র‍্যামন ম্যাগসাই, ১৯৭১ সালে কেনেডি আন্তর্জাতিক পুরস্কার, ১৯৭২ সালে 'নেহরু অ্যাওয়ার্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং', ১৯৭৩ সালে ইংল্যান্ডের 'টেম্পলটন অ্যাওয়ার্ড প্রগ্রেস ইন রিলিজিয়ন', ১৯৭৬ সালে 'বিশ্বভারতী দেশিকোত্তম', ১৯৮৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সিভিল পুরস্কার 'মডেল অব ফ্রিডম'সহ আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। ১৯৬১ সাল থেকে মাদার তেরেসা মিশনারিজ অফ চ্যারিটির সর্বোচ্চ পদ অলংকৃত করেছেন। প্রতিষ্ঠাত্রী হিসেবে ৪০ বছরেরও বেশি সময় ধরে তিনি এই সংগঠনটিকে শুধু গড়েই তোলেননি–ভালোবাসায়, মানসিক দৃঢ়তায় ক্রমাগত এই সংগঠনে শক্তি ও বেগ সঞ্চার করে ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সংগঠনেরই সদর দপ্তরে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। •

সুরুয খান ॥ লেখক

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

লেখা পাঠানোর নির্দেশনাবলি

ভারত বিচিত্রায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার সঙ্গে লেখকের নাম, ব্যাংক একাউন্ট নাম, একাউন্ট নম্বর, ব্যাংকের নাম, ব্রাঞ্চের নাম ও রাউটিং নম্বর অবশ্যই উল্লেখ থাকতে হবে। লেখার কপি রেখে নির্ভুল ঠিকানা, ফোন নম্বর ও ই-মেইলসহ আমাদের কাছে পাঠান। অমনোনীত লেখা ফেরত পাঠানো হয় না। লেখা অবশ্যই এমএস ওয়ার্ড (SutonnyMJ)-তে কম্পোজ করে দিতে হবে। সঙ্গে চেকবইয়ের ভেতরের পাতার ছবি তুলে বা স্ক্যান করে দেওয়ার অনুরোধ রইল। তথ্যসমূহ ইংরেজিতে পূরণ করে ডাকযোগে বা ই-মেইলে পাঠান। অন্যথায় লেখা মনোনীত হলেও আমরা ছাপাতে পারব না। – সম্পাদক

ভারতীয় হাই কমিশন প্লট ১-৩, পার্ক রোড, বারিধারা, ঢাকা-১২১২। ই-মেইল: inf2.dhaka@mea.gov.in

Name :..... Pen Name :.....

Address :..... Bank Account Name :.....

..... Account No :.....

..... Bank Name :.....

Phone/Mobile :..... Branch Name :.....

e-mail :..... Routing No :.....

মাননীয় হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩-এ ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয় রুপিতে (আইএনআর) প্রথম ব্যাংক নিষ্পত্তি সূচিত করে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি অব বাংলাদেশ আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গেস্ট অব অনার হিসেবে যোগদান করেন। মাননীয় হাই কমিশনার ১১ জুলাই ২০২৩-এ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে এই নতুন প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে আইএনআর-এ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক গতি সৃষ্টি হয়েছে সেটা গুরুত্বসহ তুলে ধরেন। তিনি এই ব্যবস্থার উপকারিতাসমূহ তুলে ধরেন। যার মধ্যে রয়েছে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর চাপ হ্রাস, বাণিজ্য নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে অধিকতর সুবিধা, এবং বৃহত্তর বাণিজ্য প্রতিযোগিতা, যার সবকটাই সামগ্রিক বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন বাংলাদেশের মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি।

মুক্তিযুদ্ধ গ্যালারি

ভারতীয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, এনই (কে), ১৪, ১৮০, গুলশান অ্যাভেনিউ, ঢাকা

Regd. No. DA 355, Bharat Bichitra, September, 2023

ভারতীয় হাই কমিশন লাইব্রেরি, ঢাকা

ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র এবং লাইব্রেরি
হাউজ নং : ২৪, রোড নং : ০২, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৫, বাংলাদেশ
টেলিফোন : +৮৮০২৯৬১২৩২২, ইমেইল : lib.dhaka@mea.gov.in

লাইব্রেরি সময় : রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার ॥ সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫.৩০ মিনিট

লাইব্রেরি মেম্বারশিপ ফরম : www.hcidhaka.gov.in/pdf/membershipapplicationform-292018.pdf

ভারতীয় ভিসা আবেদনকারীদের জন্য জ্ঞাতব্য

ভারতীয় হাই কমিশন ও ভিসা আবেদন কেন্দ্রের সঙ্গে কোনো এজেন্টের সম্পর্ক নেই।
ভারতীয় হাই কমিশন বাংলাদেশি নাগরিকদের কাছ থেকে কোনো ভিসা ফি নেয় না।
ভিসা আবেদন কেন্দ্র ভিসা প্রসেসিং ফি হিসেবে মাত্র ৮০০ টাকা নিয়ে থাকে।

আবেদন করার আগে দয়া করে এই তথ্যগুলো সম্পর্কে সচেতন হোন।